COSMOS
GREENCITY
BARASAT
Buy Plot in EMI
Call: 9051285489

কিচির মিচির

আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটক
চর্চাকেন্দ্র
PANTAR
যোগাযোগ : ৯৪৭৭৮ ০৭০৭৭,
৯৪৩৩২৬৪৩৯৪

১ বর্ষ ২ প্রস্তুতি সংখ্যা | ১ মে ২০১৪, ১৭ বৈশাখ, ১৪২১ | মূল্য : ১০ (দশ) টাকা

অচেনা সত্যজিৎ

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

শুধু চলচিত্রই নয়, সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা ছিল বহুমুখী, ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন বিষয়ে। তার বেশিরভাগটাই তোমরা জানো। অনেক পত্রপত্রিকায় সেটা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এতসবের পরেও কিছু বিষয় রয়ে গেছে অনেকটাই লোকচক্ষুর অন্তরালে। সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনকে স্মরণ করে এখানে তুলে ধরা হল বেশ কিছু তথ্য।

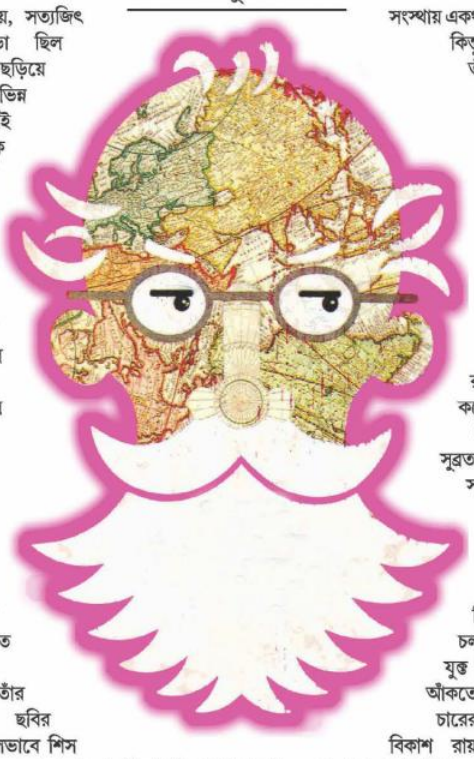

মাত্র ন'বছর বয়স থেকে জার্মানির বিশ্বখ্যাত রাগ সঙ্গীতের মধ্যমণি, বিটোভেন ছিলেন তাঁর 'হিরো'। বিটোভেন-এর সুরের স্কোর ছিল তাঁর 'বেডসাইড রিডিং'।

যৌবনকালে একটা পুরো সিম্ফনি ৩বার শুনলেই তা মুখস্থ হয়ে যেত সত্যজিতের।

একবার দেখেই তাঁর ভালোলাগা বিদেশি ছবির 'টাইটেল মিউজিক' নির্ভুলভাবে শিস দিয়ে বাজাতে সত্যজিতের কোনো অসুবিধা হত না।। উল্লেখ্য, সত্যজিৎ রায় খুব ভালো শিস দিয়ে সুর তুলতে পারতেন।

সত্যজিতের অভ্যেস ছিল কাহিনির চিত্রনাট্য করা। 'উদয়ের পথে' ছবি করার পর বিমল রায় যখন 'ফসিল' ছবির কথা ঘোষণা করেন তখন সত্যজিৎ ফসিল-এর চিত্রনাট্য লিখে ওঁর কাছে যান। প্রায় পাঁচ-ছ' ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর বিমল রায় চিত্রনাট্যটি না পড়েই সত্যজিৎকে চলে যেতে বলেন। সত্যজিৎ প্রথম চাকরিতে ঢোকেন 'ডি জে কিমার' নামে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় একথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু জানি না যেটা সেটা হল তাঁর মাইনে ছিল ৬৫ টাকা বেসিক এবং ৮০ টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স।

'ডি জে কিমার'-এর আর্ট ডিরেক্টর হয়ে তিনি ১৯৫০ সালে লন্ডন গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন সেখানকার আর্ট ডিরেক্টর মি: বল সত্যজিতের করা বিজ্ঞাপন ও পোস্টার নিজের নামে চালাচ্ছেন। রাগে অভিমানে পদত্যাগ করেন তিনি।

পাঁচের দশকে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সোসাইটি ক্লোজ আপ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি নির্দিষ্ট কলমে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির কার্টুন আঁকতেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিশু সত্যজিৎ।

চারের দশকের শেষ দিকে বিকাশ রায় রবিঠাকুরের 'তপতী' নাটকটি কলকাতার নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করেন। সেটির মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন সত্যজিৎ রায় ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত।

সত্যজিৎ রায় বিভিন্ন চলচ্চিত্রের গানও লিখেছেন। 'গুপি গাইন বাঘা

(এরপর ৬ পাতায়)

শৈশবে রবিঠাকুরের পড়াশুনা

শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সকলের প্রিয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ ৮০ বছরের জীবনে যেমন লিখেছেন প্রচুর, তেমনই পড়াশুনাও করেছেন বিস্তর। তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে শিশু-কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কী কী বই পড়েছিলেন? সবটা জানা সম্ভব না হলেও বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেইসব বইয়ের কথা বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন। জানা গেছে, তাঁর সংস্পর্শে থাকা মানুষজনের লেখা থেকেও। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নভাবে সারাজীবন পড়াশুনার মধ্যে ছিলেন, কখনোই থেমে যায়নি তাঁর মনের চাহিদা।

রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা বই 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় যে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়েছিল গুরুমশায়ের পাঠশালায়। সেই পাঠশালা ছিল তাঁদের বাড়িরই চণ্ডীমণ্ডপে। শুরুতেই অন্যান্য পাঁচটি বাঙালি শিশুর মতোই 'বর্ণপরিচয়' পড়েছিলেন। শিশুকালেই তিনি পড়েছিলেন 'বোধোদয়'। এছাড়াও বিদ্যাসাগর অনুদিত ডব্রু চেম্বার এবং আর চেম্বার লিখিত 'Rudiments of Knowledge' বইটিও পড়েছিলেন। এই বইটি পড়েই শিশু রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, আকাশের নীল রঙ কোনো বাধা নয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ না করলেও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' বইটিও পড়েছিলেন শৈশবেই। সম্ভবত, 'শিশুবোধক' বইটিও পড়েছিলেন তিনি।

(এরপর ৬ পাতায়)

Health is Wealth,
but Health may Shallow Wealth.
A comprehensive health plan
that takes care of your extended family too

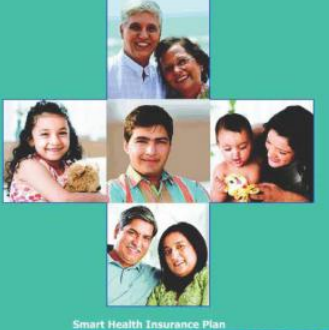

Smart Health Insurance Plan
+ Covers extended family: Self + Spouse + Kids + Parents/In-law
+ Hospital Cash Benefit
+ Major Surgical Benefit for 140 listed surgeries
+ Day Care Procedure Benefit for 140 more listed surgeries
+ Other Surgical Benefit for all other surgical procedures*
+ Full Entitlement paid irrespective of actual expenses
+ 50% Advance MDS available under Quick Cash Facility*
+ No Claim Benefit/Increasing health cover
+ Term/Accident Insurance rider for Principal Insured and Spouse

For details contact :
9163005332
9874354473

প্রয়াত হলেন ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রাণপুরুষ গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ১৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার মেক্সিকোয় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মার্কেজ ১৯২৭ সালের ৬ মার্চ কলোম্বিয়ার মাগদালেনা বিভাগের আরাকাতাকা গ্রামে টেলিগ্রাফ অপারেটর ও ওষুধসামগ্রী বিক্রেতা গ্যাব্রিয়েল এলিহিও গার্সিও এবং তাঁর স্ত্রী লাউসা সান্তিয়াগা ইগুয়ারান-এর প্রথম সন্তান মার্কেজের জন্ম। দিদিমার কাছে মানুষ। ৯ বছর বয়সে পড়ে ফেলেন

আলিফ লায়লা অর্থাৎ সহস্র এক আরব্য রজনী। ১৯৪০ সালে কবিতা লেখা শুরু। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা গল্প প্রকাশ হতে শুরু করে। তাঁর প্রথম বই ওহোস দে পেররো আসুল (নীল কুকুরের চোখ)। সাংবাদিকতাও শুরু করেন। লেখেন সিনেমার কলম। ১৪ কিস্তিতে লেখেন 'এক বিপন্ন নাবিকের কাহিনি'। ১৯৫৬ সালে 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না' উপন্যাসের খসড়া লেখেন। একক চিত্রনাট্য 'এল গাইয়ো দে ওরো' (সোনার মুরগি) লেখেন। ১৯৬৭ সালে অসামান্য উপন্যাস 'সিয়েন আনিওস দে সোলেদাদ' (নিঃসঙ্গতার একশ বছর) প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় 'একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জী'। ১৯৮২তে নোবেল।

নোবেলজয়ী এই মৃত্যুঞ্জয়ীকে কিচির মিচির-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সবার সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায় আমাদের গর্বের। এক বিরাট প্রতিভা নিঃসন্দেহে, কিন্তু সঙ্গে নিষ্ঠা, গভীর আন্তরিকতা ও প্রচণ্ড জেদ এবং সাধারণ মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও সহমর্মিতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে অসামান্য শিল্পসৃষ্টিতে। সেই মহান ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে **কিচির মিচির**-এর প্রতিবেদন।

২ বছর বয়সের সত্যজিৎ

"জান তোমায় বলছি শোন,
হব যখন তোমার মত বড়
লিখব লেখা ঝুড়ি ঝুড়ি
পাঠিয়ে দেব তোমার বাড়ি।
তুমি তোমার সন্দেশেতে
লেখাগুলি সাজাবে বসে।
এই আনন্দে দিচ্ছি গড়াগড়ি।"

আট বছর বয়েসের একটি বাচ্চা ছেলে এই ছড়াটি লিখেছিল। আর এই ছেলেটাই যখন তার মেধা, বুদ্ধি, মনন নিয়ে বড়ো হল, গোটা দেশ, পৃথিবী তাঁকে জানল - সত্যজিৎ রায় নামে।

মে মাস। বাংলার মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কারণ এই মাসেই বাঙালি পালন করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের জন্মদিন। এছাড়াও ১৯৯২ সালের পর থেকে এই মে মাসেই বাঙালি পালন করতে শুরু করেছে সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনও।

দিনটি ছিল ২ মে, ১৯২১। ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় পড়তে এসে এই কলকাতারই প্রেমে পড়ে যাওয়া আরো অন্যান্য লাখো মানুষের মতোই যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তাঁরই পুত্র সুকুমার রায়ের স্ত্রী সেদিন জন্ম দিয়েছিলেন উপেন্দ্রর নাতি প্রসাদ-এর। ১০নং গড়পার রোডে জন্ম নেওয়া সেই শিশুটিরই দু'বছর পরে নতুন নামকরণ হয় সত্যজিৎ।

নতুন নামকরণের কয়েকমাস পরেই ১০ সেপ্টেম্বর, আড়াই বছরের শিশু সত্যজিৎকে ফেলে রেখে চিরনিদ্রায় যান সুকুমার রায়। রবীন্দ্র স্নেহধন্য বাবা সুকুমারকে তাই বড়ো হয়ে ওঠার পথে পাননি সত্যজিৎ। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া অজস্র বই আর তার মজা চিরকাল বহন করেছেন। বাবার কিছু স্মৃতির কথা সত্যজিৎ রায় অবশ্য তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। "গঙ্গার উপর সোদপুরের বাড়ির উঠোনটা মনে আছে। একদিন বাবা ছবি আঁকছেন ঘরে জানলার ধারে বসে, এমন সময় হঠাৎ বললেন, 'জাহাজ যাচ্ছে।' আমি দৌড়ে উঠোনে বেরিয়ে এসে দেখলাম ভোঁ বাজিয়ে একটা স্টিমার চলে গেল।" (**সত্যজিৎ রায়, *'যখন ছোট ছিলাম'*, পৃঃ - ১১**)।

গড়পার রোডে যৌথ পরিবারে একটু একটু করে বড়ো হয়ে ওঠা শিশু সত্যজিতের মনে দাগ কেটে যেত 'ধনদাদু' কুলদারঞ্জন রায়ের পুরাণের গল্প। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই মায়ের হাত ধরে সত্যজিৎকে চলে আসতে হলো ভবানীপুরে 'সোনামামা' প্রশান্তকুমার দাসের বাড়িতে। ঋণের দায়ে দাদুর বাড়ি হারাতে হল, চলে গেল সমস্ত সম্পত্তি। শুরু হল শিশু সত্যজিৎকে বড়ো করে তোলার জন্য তাঁর মায়ের জীবন সংগ্রাম।

প্রতিটি ব্যক্তির শিশু এবং কৈশোর ভরা থাকে তাঁর নিজস্ব কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। এর ব্যতিক্রম সত্যজিতের জীবনেও হয়নি। অল্প সময়ের জন্য যাঁদের সঙ্গ তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন, নন্দলাল বসু এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আট বছরের সত্যজিতের অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্রনাথ একটি আট লাইনের কবিতা লিখে দিয়েছিলেন -

"বহু দিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে বিএ পাশ করার পর তিনি ভর্তি হলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। এই ১৯৪০ সালেই

(এরপর ৪ পাতায়)

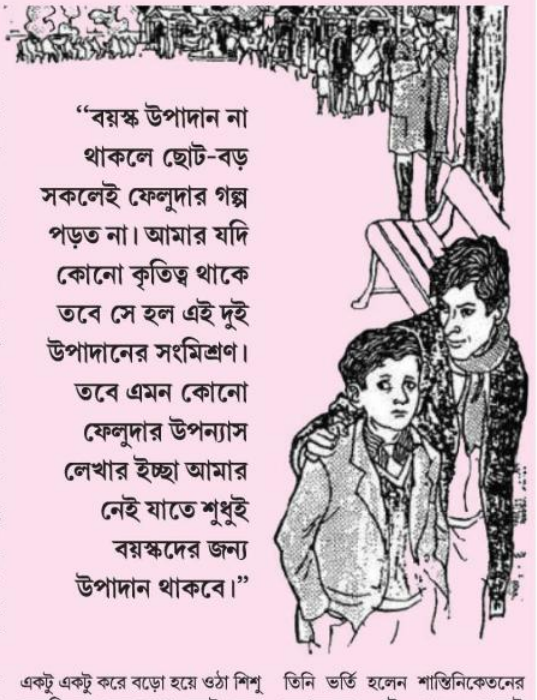

"বয়স্ক উপাদান না থাকলে ছোট-বড় সকলেই ফেলুদার গল্প পড়ত না। আমার যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে তবে সে হল এই দুই উপাদানের সংমিশ্রণ। তবে এমন কোনো ফেলুদার উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আমার নেই যাতে শুধুই বয়স্কদের জন্য উপাদান থাকবে।"

তথ্য মাণিক ...

১৯২১ উত্তর কলকাতার গড়পার রোডে ২ মে জন্ম হয়েছিল সুকুমার রায় ও সুপ্রভা রায়চৌধুরীর প্রথম ও একমাত্র সন্তান প্রসাদ-এর।

১৯২৩ ২মে নামকরণ অনুষ্ঠানে প্রসাদ-এর পরিবর্তে নাম রাখা হয় সত্যজিৎ রায়। ১০ সেপ্টেম্বর, প্রায় আড়াই বছর কালাজ্বরে ভুগে মৃত্যু হয়েছিল পিতা সুকুমার-এর।

১৯২৫ পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' দেউলিয়া ঘোষণা হলে নিলামে নামমাত্র মূল্যে 'প্রসেস ডিপার্টমেন্ট' সমেত কোম্পানির গুডউইল কিনে নেয় করুণাবিন্দু বিশ্বাস।

১৯২৬ সুপ্রভা দেবী পুত্র সত্যজিৎকে নিয়ে ভবানীপুর বকুলবাগানে তাঁর ভাই প্রশান্তকুমার দাসের বাড়িতে উঠে আসেন। লেডি অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন বিধবাশ্রম'-এ সেলাই করে সংসার চালাবার চেষ্টা করেন।

১৯৩০ সাড়ে আট বছর বয়সে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন।

১৯৩৬ ভয়েটল্যান্ডার ক্যামেরায় ছবি তুলে 'বয়েজ ওন পেপার' পত্রিকায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন।
ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। অনার্স ছিল অর্থনীতি বিষয়ে।

১৯৪০ বি.এ. পাশ করার পর ১৩ জুলাই ভর্তি হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে কলাভবন-এ।

১৯৪২ কলকাতায় জাপানি বিমান আক্রমণ, ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৯৪৩ দিলীপকুমার গুপ্ত-র সঙ্গে আলাপ। এপ্রিল মাসে বিজ্ঞাপন সংস্থা 'ডি জে কিমার'-এ 'ভিসুয়ালাইজার' পদে যোগদান। ৩০ অক্টোবর, সুকুমার রায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে সিগনেট প্রেসের উদ্বোধন। বইয়ের প্রচ্ছদ ও ইলাসট্রেশনের কাজ শুরু।

১৯৪৪ চিত্রনাট্য লেখা শুরু। ঝিন্দের বন্দী, বিলাসমন প্রথম দিকের চিত্রনাট্য।

১৯৪৫ পথের পাঁচালী-র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'-র ইলাসট্রেশন করেন।

১৯৪৬ 'ঘরে-বাইরে'র পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য রচনা করেন।

১৯৪৭ হরিসাধন দাশগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত'র সহযোগে ৫ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা করেন 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'।

১৯৪৮ মাকে নিয়ে লেক অ্যাভিনিউ-তে আলাদা বাড়িতে চলে আসেন। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত প্রথম লেখা প্রকাশিত 'স্টেটসম্যান'-এ। 'ন্যাশনাল এডুকেশন ইনফরমেশন ফিল্ম' প্রযোজিত বিজ্ঞাপন চিত্র 'এ পারফেক্ট ডে'-র চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত।

১৯৫০ সত্যজিতের লেখা 'রেঁনোয়া ইন ক্যালকাটা' প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ পত্রিকা 'সিকোয়েন্স'-এ।
ডি জে কিমার-এর আর্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত।
সত্যজিতের আঁকা বিজ্ঞাপন কিমারের জনৈক পরিচালক নিজের বলে দাবি করায় কিমার ত্যাগ করে তিনি 'বেনসন'স এজেন্সি'তে যোগ দেন।
আন্তর্জাতিক মুদ্রণ প্রদর্শনীতে 'খাই খাই' ও 'অন্যান্য' গ্রন্থের প্রচ্ছদের জন্যে পুরস্কার অর্জন।

১৯৫৫ এপ্রিলে নিউইয়র্কে 'মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট'-এ প্রথম 'পথের পাঁচালী' প্রদর্শিত হয়।
২৬ আগস্ট মুক্তি পায় কলকাতায়।

(এরপর ৩ পাতায়)

মা রাগ করলে বুঝতে পারি

আমি ফেলুদার গল্প এখনো পড়িনি। কিন্তু 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'সোনার কেল্লা' - এই ছবিগুলো বাবা-মার সঙ্গে দেখেছি। ছবিগুলোতে তোপসেকে দেখে আমার খুব হিংসে হয়েছে। বারবার মনে হয়েছে, ইস্! আমি যদি তোপসে হতে পারতাম কি মজাই যে হত তাহলে। আর তাছাড়া আমি তো খুব সহজেই ফেলুদার তোপসে হতে পারি। তোপসের মধ্যে যা যা গুণ আছে সবকটাই আমার আছে। ফেলুদার তোপসে হতে গেলে সবার প্রথমে চাই মাথা ভর্তি অনেক বুদ্ধি। আমাকে কেউ বোকা বানাতে পারে না। সবাই তো আমাকে বুদ্ধিমতিই বলে। তারপরে চাই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। যেকোনো ঘটনার খুঁটিনাটি লক্ষ্য করা। আর এটা আমি খুব ভলোই পারি। কে কী করল, কী পোষাক পরল, কীভাবে কথা বলল, সব আমি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করি। এমনকী মা কোনো নতুন দুল বা ক্লিপ কিনলেও আমি সেটা বুঝতে পারি। ফেলুদার তোপসে খুব ভালো ধাঁধাঁর জবাব দিতে পারে। আমিও দাদাগিরির গুগলি রাউন্ডের প্রায় সব উত্তর বলতে পারি। তোপসে যেমন বুঝতে পারে ফেলুদা কখন কী বলতে চাইছে সেরকম আমিও খুব চট করে মাকে আদর করলেই বুঝতে পারি বাবা রেগে যাচ্ছে বা বাবাকে আদর করলেই মা রাগ করছে। তোপসে হতে পারলে কত নতুন জায়গায় যেতে পারতাম। নতুন মানুষের সাথে কথা বলতে পারতাম। একজন সত্যিকারের ফেলুদা যদি এখন থাকত তবে আমি ঠিক তোপসে হয়ে ফেলুদার সাথে সাথে ঘুরে একটা মগনলালকে ধরে ফেলতাম।

কুর্চি চট্টোপাধ্যায়
শ্রেণি : তৃতীয়,
আওয়ার লেডি কুইন মিশন স্কুল, কলকাতা

আমি তোপসে

তোপসে নামটা সবারই চেনা। আমি মনে করি পৃথিবীর বিখ্যাত গোয়েন্দাদের সহকারীদের পাশে তোপসের নামটা রাখা যায়। প্রত্যেকের জীবনে যেমন কিছু স্বপ্ন থাকে তেমনই আমার জীবনের স্বপ্ন হল তোপসের মতো একজন গোয়েন্দা সহকারী হওয়া। কিন্তু তোপসে হওয়া অত সহজ কথা নয়। এর জন্য বিশেষ কিছু গুণ থাকা চাই। গোয়েন্দা হওয়ার প্রথম গুণটি হল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এছাড়া যথেষ্ট পরিমাণ উপস্থিত বুদ্ধি, প্রাণের মায়া ত্যাগ করা, বাধাহীন কিন্তু সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষমতা প্রভৃতি - আমি মনে করি এইসবই আমার মধ্যে বর্তমান।

আমি সারা বছর টাকা জমাই ডিসেম্বর মাসে বইমেলা থেকে ফেলুদার বই কেনার জন্য। যে কোনো বাঙালি ছেলে যদি ছোটবেলা থেকে ফেলুদার বই পড়ে তাহলে একসময় সে নিজেকে তোপসে ভাবতে শুরু করবেই করবে। অবশ্য ফেলুদাও ভাবতে পারে। যাই হোক, যে নিজেকে তোপসে ভাববে সে 'এক্সপেক্ট' করবে কোনো এক সময় ফেলুদা এসে তার মাথায় হাত রাখবে। মজার কথা হচ্ছে, তোপসের মধ্যে একটা খুনসুটির ভাব আছে। কিন্তু যখন সিরিয়াস, তখন ভীষণ সিরিয়াস। তার এই ভাবটা আমায় মুগ্ধ করে। আমার কাছে 'ফেলুদা' 'তোপসে' মানে তাই। প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত বাঙালি, কিন্তু আন্তর্জাতিক। যেমন জেনারেল নলেজ, দায়িত্ববোধ, রসিক, তেমনি অনুসন্ধান করার ক্ষমতা, ফিটনেস। আমার মনে হয়েছে সব মিলিয়ে এক স্বয়ং সম্পূর্ণ চরিত্র। আর সেই চরিত্রের সমস্ত গুণাবলী আমার মধ্যে আছে বলেই আমি নিজেকে তোপসে হিসেবে নিজেকে যোগ্য মনে করি।

কৌস্তভ পাল
শ্রেণি : সপ্তম
শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দির, চন্দননগর

মগজাস্ত্রই আমার শক্তি

ছোটোবেলা থেকেই গোয়েন্দা বই পড়তে পড়তে কখন নিজের অজান্তেই গোয়েন্দা হওয়ার সখ মনের মধ্যে পুষতে শুরু করেছিলাম সেটাই বুঝতে পারিনি। গোয়েন্দারা কীভাবে কথা বলে, চলাফেরা করে সেই সব নজর করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চিন্তার গতিপথ বুঝতে চেষ্টা করতাম। করতে করতে কখন যেন আমিও যে কোনও ঘটনাকেই সেইভাবেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে শুরু করি, নিজের অজান্তেই। হঠাৎই সুযোগ এলো নিজেকে প্রমাণ করার। ফেলুদার সহকারী তোপসে হয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। ফলে মেঘ না চাইতেই জল। নিজেকে আরও তৈরি করতে শুরু করলাম। তারপর মনে হল - ঠিকই তো তোপসে হওয়ার সবকটা গুণ-ই আমার মধ্যে আছে– প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যে কোনো সমস্যাকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর প্রচণ্ড সাহস। তবে এগুলো ছাড়াও আরও একটা গুণের প্রয়োজন - সেটা উপস্থিত বুদ্ধি। এই বুদ্ধি দিয়েই অনেক বিপরীত পরিবেশকে অনুকূলে আনা যায় আর আমি যেহেতু সবসময়ই বড়োদের কথা মেনে চলি তাই ফেলুদাকে অনুসরণ করতে তো আমার কোনো অসুবিধাই হবে না। যে কোনো রহস্যের জট খুলতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা কোনো পারিশ্রমিক দিয়েই মূল্যায়ন করা যায় না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য শারীরিক বলেরও প্রয়োজন হয় - তবুও একটা কথা তো প্রমাণিত 'বুদ্ধি যার বল তার'। তাই আমি ফেলুদার মতো 'মগজাস্ত্র' প্রয়োগেই বেশি আগ্রহী। আর সেই কারণেই বোধহয় ফেলুদারও আমাকেই পছন্দ হবে তার একম্ এবম্ অদ্বিতীয়ম্ সহকারী হিসেবে।

অনংশা বক্সী
শ্রেণি : নবম
দি ফিউচার ফাউন্ডেশন, কলকাতা

ক্ষুদে পাঠকের মতামত

শতবর্ষে অজয় হোম ব্রাত্য কেন?

ছোট্ট ছেলে, পরিচিত 'খুচু' নামে। নানা বিষয়ে আগ্রহ। এই বালকের ১০ বছরের জন্মদিনে তাঁর বাবার বন্ধু ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী একটি ময়না পাখি উপহার দেন। সেই থেকেই শুরু বালক, খুচুর পক্ষীপ্রেম। পাখিরপ্রতিতারভালবাসা,মমত্ব, আগ্রহ তাকে পরবর্তী সময়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ পক্ষীবিদের সম্মান এনে দেয়। প্রথম বাঙালি হিসেবে পক্ষীবিদ ছিলেন ড. সত্যচরণ লাহা, তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারী এই 'খুচু', যাঁকে আমরা অজয় হোম।

শুরুতেই এই গল্পকথা বলার কারণ দুটি। প্রথমত, আপনাদের প্রথম সংখ্যায় 'বর্ন টু ফ্লাই' লেখাটি পড়ে ভালো লেগেছে। কিন্তু বাংলার পাখি নিয়ে আলোচনা হলেই অজয় হোমের নামটি চলে আসে। অথচ আপনাদের পত্রিকায় তাঁর নামই নেই।

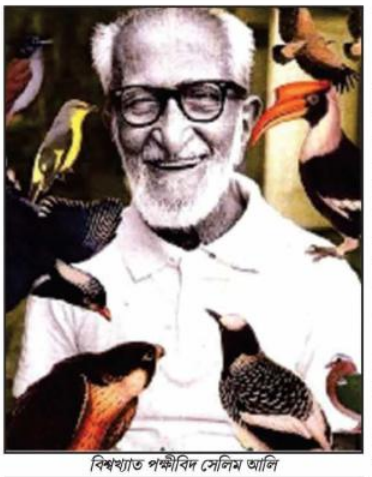

বিশ্বখ্যাত পক্ষীবিদ সেলিম আলি

দ্বিতীয়ত, ১৯১৩ সালের ২ মে কলকাতায়, অজয় হোমের জন্ম। হিসেব অনুযায়ী আপনাদের পত্রিকা প্রকাশের সময়ে তাঁরও জন্মশতবার্ষিকী চলছে। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর নামটি উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর লেখা 'বাংলার পাখি' বইটি পক্ষীপ্রেমীদের কাছে আজও আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। তাছাড়াও বিশ্বখ্যাত পক্ষীবিদ সেলিম আলির নামও থাকা উচিত ছিল।

আপনাদের গোটা পত্রিকাটি আকর্ষণীয় ঝকঝকে হলেও, সাদা-কালো ছাপা অংশে ছন্দটা কেমন কেটে গেল বলে মনে হয়েছে। এই বিষয়ে নজর দিলে ভালো হয়। পত্রিকার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শুভার্থী চক্রবর্তী
ডানকুনি-পাঠভবন, হুগলি

তোমাদের জন্য এই প্রতিযোগিতা। প্রতি সংখ্যায় আমরা দেবো একটি কাল্পনিক বিষয়। তোমাদের কাজ হবে সেই বিষয়ের ওপর ২০০ শব্দের মধ্যে লিখে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া। চুপিচুপি বলে রাখি, বাবা-মা বা বড়োদের সাহায্য নিলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পেরে যাবো। লেখা হলেই আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। খামের ওপর লিখবে -

মেলে দিলেম ইচ্ছেডানা
প্রযত্নে - **কিচির মিচির,**
৯, কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১

পাঠাতে পারো ই-মেল করেও। আমাদের ই-মেল - kichirmichirkol@gmail.com। লেখা পাঠাতে হবে ৮ মে-র মধ্যে। লেখা হবে ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে। দু'পাশে যথেষ্ট ছাড় দিয়ে লিখবে। নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণি পরিস্কার করে উল্লেখ করবে।

: প্রতিযোগিতার বিষয় :

একদিন সকালে উঠে দেখলে পৃথিবীর সব ফুলের রঙ সাদা হয়ে গেছে ...

শুরু হয়েছে খেলা নিয়ে আকর্ষণীয় এক কলম। একটু অন্যরকম। হবেই। শুধু মনে নয়, মননেও দাগ কাটবে। খেলা মানে, শুধু খেলাই নয়, খেলার আগে, পিছে বা সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মজাটাকে তুলে ধরাই এই কলমের মূল লক্ষ্য। - **কিচির মিচির**

অবাক খেলা

অলক চট্টোপাধ্যায়

খেলাধুলোয় লড়াই আছে, থাকবেও। কিন্তু হিংসুটেপনার কোনো সুযোগ নেই। কেউ কেউ 'কিচির মিচির'-র প্রথম সংখ্যায় এই ধারাবাহিক লেখায় শুধুই ফুটবলের উল্লেখ থাকার জন্য মৃদু অভিযোগ করেছেন। সবিনয়ে জানাই কোনো বিশেষ ভাবনায় ফুটবলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু কথা যখন উঠেছে, তখন এবার থেকে শুধুই ফুটবল নয়, নানা ধরনের খেলার উল্লেখ এই পাতায় থাকবে। এবং ছোটো-বড়ো ঘটনাগুলোর একটা শিরোনামও দেওয়া হবে।

ফুটবলের গান

খুব স্বাভাবিক বিচারে ফুটবল গোটা দুনিয়ার মতো ইংল্যান্ডেরও সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। সেখানে ফুটবল মাঠে দর্শকরা নিজের প্রিয় দলের সমর্থনে কিন্তু শুধু চিৎকার বা সমবেত হাততালিতে ব্যস্ত থাকেন না। নিজেদের পছন্দের ক্লাবের সমর্থনে তাঁদের গানও গাইতে হয়। সমবেত কণ্ঠের গান। সুতরাং নিজেদের প্রিয় ক্লাবকে সমর্থনের জন্য নির্দিষ্ট গানটিও শিখতে হবে। অধিকাংশ গানই কিন্তু চমৎকার ও বৈচিত্র্যময়। যেমন কথা, তেমন সুর। ক্লাবকে ভালোবেসে নির্মিত গান তো, সেইজন্য গানগুলো ইংল্যান্ডে এতটাই জনপ্রিয় যে অভিজ্ঞ ফুটবলপ্রেমিকরা গান শুনেই বলে দিতে পারেন সেটা কোন ক্লাবের গান। কয়েকটা উদাহরণ দিলে হয়তো পড়ুয়াদেরও মনে থাকবে -

১। ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেড (ক্লাব)
I am Forever Blowing Bubbles' (গান)
২। লিভারপুর (ক্লাব)
You'll Never Walk Alone. (গান)
৩। টটেনহ্যাম হস্পার (ক্লাব)
John Brown's Body. (গান)
৪। রেঞ্জার্স (ক্লাব)
Follow, Follow, We Will Follow Rangers. (গান)

কবে যে আমাদের দেশেও এমন গান গাওয়ার অভ্যাস চালু হবে।

রেফারি স্যারের ঘড়ি

প্রকৃত অর্থে ফুটবল মাঠের একমাত্র স্যার হচ্ছেন রেফারি। তাঁর যোগ্যতা, মেজাজ ও ইচ্ছের ওপরই একজন ফুটবলারই নয়, একটা দলের ভাগ্যও নির্ভর করে। আর সেখানে স্যারের হাতের ঘড়িটার ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা হাতে ঘড়ি থাকলেই হয় না। খেলা চলার সময় মাঠের সর্বত্র ছুটতে ছুটতে স্যারকে ঘড়ি দেখতে হয়। সেই ঘড়ি দেখায় বাজে মুখের বাঁশি। খেলাটার শুরু ও শেষের সংকেত সেটাও ওই বাঁশিনির্ভর ঘটনা। একবার বাঁশি বাজানোর ভুলে একটা দলের বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা থেকেও বিদায় নিতে হয়েছিল। সেটা ১৯৩০-এর বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। তখন মাত্র কয়েকঘণ্টায় পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বিমানে উড়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। তখন সেই মহাসাগরের ঢেউয়ে নাচতে নাচতে জাহাজে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পৌঁছানো। ইউরোপের একটা দেশ হিসেবে ফ্রান্স প্রায় দু-সপ্তাহ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়েতে পৌঁছেছিল। কিন্তু সেখানে দীর্ঘ সময় থেকে প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায়নি ফ্রান্স। প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোকে ৪-১ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় খেলাতেই তাদের খেলতে হয়েছিল আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই খেলাতে ৮১ মিনিটে একটা গোল করে আর্জেন্টিনা এগিয়ে যায়। গোল শোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে ফ্রান্স যখন আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিল, তখন ম্যাচের ৮৪ মিনিটে রেফরি স্যার (ব্রাজিলের অ্যালমেইডা রেগো) খেলা শেষের বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছিলেন। পরে লাইন্সম্যানদের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার খেলা শুরু হলেও নানা কারণে খেলার স্বাভাবিক ছন্দ গিয়েছিল হারিয়ে। ফ্রান্সের ফুটবলারদের প্রতিবাদের সময় মাঠে পুলিশ, ঠিক সেই সময়েই আর্জেন্টিনার লেফট ইন-সাইড সিয়েরো মাঠেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। হতাশ ফ্রান্স পরের ম্যাচে চিলির কাছে ০-১ গোলে হেরে আবার প্রায় দু-সপ্তাহ সাগরে ভেসে দেশে ফিরেছিল।

মার্টিনার মূর্তি প্রেম

তারকা খেলোয়াড়দেরও নানারকমের শৌখিন বস্তু সংগ্রহের ইচ্ছে থাকে। সেজন্য তাঁরা অনেক অর্থও ব্যয় করেন। টেনিস ইতিহাসের এক সেরা মহিলা খেলোয়াড় মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার যেমন শিল্পময় মূর্তি সংগ্রহের অভ্যাস আছে। বিশেষ করে ব্রোঞ্জ অথবা মার্বেল পাথরের ছোটো মূর্তি যেখানে কোনো মহিলা বর্শা ছুঁড়ছে বা তীর-ধনুক ব্যবহার করছে - এই ধরনের কিছু থাকলে মার্টিনা সেটি সংগ্রহ করবেনই।

রাশিয়ায় স্কুলে দাবা আবশ্যিক

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

দাবা চর্চা। ধারাবাহিকভাবে এই কলমটি তোমাদের জন্য লিখবার দায়িত্ব আমার উপরে পড়েছে। যখন লেখার অনুরোধ নিয়ে আমার সঙ্গে 'কিচির মিচির' যোগাযোগ করে, তখনই আমি কিছু শর্ত দিয়েছিলাম। তারমধ্যে শুরুতেই যে কথাটা বলেছিলাম, তা হল - দাবা খেলা শুধুমাত্র মগজের বিষয় নয়। দাবাড়ুর থাকতে হয় চূড়ান্ত শারীরিক সক্ষমতা। অনেকেই হয়তো কথাটা শুনে অবাক হন, কিন্তু এই সত্যিটাই আমি প্রথমে তুলে ধরতে চাই বলে 'কিচির মিচির'-এর সম্মতি আদায় করে নিয়েছিলাম।

তোমরা হয়তো আশ্চর্য হবে শুনে এইকম কিছু তথ্য তুলে ধরছি। তথ্য তুলে ধরছি এই কারণে যে, দাবা চর্চা করতে গেলে শারীরিক সক্ষমতা কোন পর্যায়ে থাকলে ভালো হয় সেটা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে। একই সঙ্গে তোমরা এটাও বুঝতে পারবে বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা বরেণ্য তাঁরা সুযোগ পেলেই দাবাতে সময় দিতেন।

প্রথমেই বিশ্বনাথন আনন্দ-এর কথা দিয়ে শুরু করা যাক। আমার ব্যক্তিগতভাবে ওঁনার সঙ্গে খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল, বেঙ্গালুরুতে। যদিও তখন আনন্দের বয়স ১৮-র আশেপাশে হবে। যাই হোক, একটি সাক্ষাৎকারে উনি বলেছিলেন, মানসিকভাবে ক্লান্ত হওয়া শারীরিক ক্লান্তির থেকেও বেশি কষ্টদায়ক। আপনি ঘুমোলে শারীরিক ক্লান্তি দূর হবে, কিন্তু মানসিক ক্লান্তি থাকলে ঘুমই আসবে না। পাশাপাশি, শারীরিক সুস্থতাও দাবা খেলার জন্য জরুরি। ৭-৮ ঘণ্টা প্রতিদিন অনুশীলনের জন্য মানসিকভাবে ফিট থাকার পাশাপাশি শারীরিকভাবেও ফিট থাকতে হয়। সামান্য সর্দি-কাশিও একজন দাবাড়ুর দক্ষতায় প্রভাব ফেলতে পারে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, দাবা চর্চাতে শুধু মগজে শান দিলেই হবে না, শারীরিক সুস্থতার দিকেও নজর দিতে হবে।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নিলস্ বোর জার্মানিতে দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন।

প্রখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু রাশিয়া সফরের সময় সেখানকার দাবা চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে দাবা খেলায় অংশ নিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত গ্র্যান্ডমাস্টার কার্লসেন নরওয়ের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের একটি দলে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ছিলেন।

গ্যারি কাসপরভ রাশিয়ার বুকে দৌড় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। তিনি ১১ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়াতে সক্ষম ছিলেন। প্রখ্যাত বাঙালি চিত্রপরিচালক তথা সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ও নিয়মিত দাবা চর্চা করতেন।

রাশিয়াতে স্কুলে পড়াশুনার সঙ্গে দাবা খেলতেই হয় প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে। কিন্তু পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হলে দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না। এই কথা শুনেছিলাম সাতের দশকে। সেই সময় বিখ্যাত দাবাড়ু য়ুরি অ্যাবারবাখ কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে আমি তার সাথে 'সাইমালটেনিয়াস ডিসপ্লে'তে অংশ নিয়েছিলাম। তখনই কথা প্রসঙ্গে অ্যাবারবাখ এই কথা জানিয়েছিলেন। অতএব, তোমরা দাবা খেলো, কিন্তু শারীরিক ভাবে ফিট থাকার জন্য নিয়মিত এক্সাসাইজও করো। পড়াশুনাতেও ভালো করতে হলে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। পাশাপাশি, পড়াশুনাকে ব্যাহত না করে দাবা চর্চা করবে। পরের সংখ্যায় জানবে দাবা সম্পর্কে আরো নতুন কিছু। ততদিন পড়াশুনা চালিয়ে যাও, সঙ্গে এক্সাসাইজ। *(চলবে)*

লেখক প্রখ্যাত দাবাড়ু এবং প্রাক্তন জাতীয় দাবা খেলোয়াড়। যুক্ত রয়েছেন গোর্কি সদনের সঙ্গে। প্রণব চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে সরাসরি 'কিচির মিচির'-এ চিঠি লিখুন।

গুপ্তধন

হিংসুটি

সুকুমার রায়

এক ছিল দুষ্টু মেয়ে— বেজায় হিংসুটে আর বেজায় ঝগড়াটে। তার নাম বলতে গেলেই তো মুশকিল, কারণ ওই নামে সন্দেশের শান্ত লক্ষ্মী পাঠিকা যদি কেউ থাকেন, তাঁরা তো আমার উপর চটে যাবেন।

হিংসুটির দিদি বড় লক্ষ্মী মেয়ে-যেমন কাজকর্মে তেমন লেখাপড়ায়। হিংসুটির বয়স সাত বছর হয়ে গেল, এখনও তার প্রথমভাগই শেষ হল না—আর তার দিদি তার চাইতে মোটে এক বছরের বড়—সে এখনই 'বোধোদয়' আর 'ছেলেদের রামায়ণ' পড়ে ফেলেছে। ইংরিজি ফার্স্টবুক তার কবে শেষ হয়ে গেছে। হিংসুটি কিনা সবাইকে হিংসে করে, সে তার দিদিকেও হিংসে করত। দিদি স্কুলে যায়, প্রাইজ পায়—হিংসুটি খালি বকুনি খায় আর শাস্তি পায়।

দিদি সেবার ছবির বই প্রাইজ পেল, আর হিংসুটি কিচ্ছু পেল না, তখন যদি তার অভিমান দেখতে! সে সারাটি দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বসে রইল—কারও সঙ্গে কথাই বলল না। তারপর রাত্রিবেলায় দিদির অনেক সুন্দর বইখানাকে কালি ঢেলে মলাট ছিঁড়ে কাদায় ফেলে নষ্ট করে দিল। এমন দুষ্টু হিংসুটে মেয়ে।

হিংসুটির মামা এসেছেন, তিনি মিঠাই এনে দু'বোনকেই আদর করে খেতে দিয়েছেন। হিংসুটি খানিকক্ষণ তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিরে,কি হল? জিভে কামড় লাগল নাকি?' হিংসুটির মুখে আর কথা নেই, সে কেবলই কাঁদছে। তখন তার মা একবার ধমক দিয়ে বললেন 'কি হয়েছে বল না!' তখন হিংসুটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দিদির ওই রসমুণ্ডিটা আমারটার চাইতেও বড়।' তাই শুনে দিদি তাড়াতাড়ি নিজের রসমুণ্ডিটা তাকে দিয়ে দিল। অথচ হিংসুটি নিজে যা খাবার পেয়েছিল তার অর্ধেক সে খেতে পারল না—নষ্ট করে ফেলে দিল। দিদির

জন্মদিনে দিদির জন্য নতুন কাপড় জামা আসলে হিংসুটি তাই নিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তোলে।

একদিন হিংসুটি তার মায়ের আলমারি খুলে দেখে কি, লাল জামা গায়ে, লাল জুতো পায়ে, টুকটুকে রাঙা পুতুল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে। হিংসুটি বলল, 'দেখেছ! দিদি কি দুষ্টু! নিশ্চয় মামার কাছ থেকে পুতুল আদায় করেছে—আবার আমায় না দেখিয়ে মায়ের কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' তখন তার ভয়ানক রাগ হল। সে ভাবল, 'আমি তো ছোট বোন, আমারই তো পুতুল পাওয়া উচিত। দিদি কেন মিছিমিছি পুতুল পাবে?' এই ভেবে সে পুতুলটাকে উঠিয়ে নিল।

কি সুন্দর পুতুল! কেমন মিটমিটে চোখ, আর ফুটফুটে মুখ,কেমন কচি কচি হাত পা,আর টুকটুকে জামাকাপড়। যতসব ভাল ভাল জিনিস কিনা দিদি পাবে! হিংসুটির চোখ ফেটে জল এল। সে রেগে পুতুলটাকে আছড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তাতেও তার রাগ গেল না; সে একটা ডান্ডা দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে পুতুলটাকে মারতে লাগল। মারতে মারতে তার নাক মুখ হাত পা ভেঙে তার জামাকাপড় ছিঁড়ে—আবার তাকে বাক্সের মধ্যে ঠেসে সে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

বিকেলবেলায় মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন আর বললেন, 'তোর জন্য কি এনেছি দেখিসনি?" শুনে হিংসুটি দৌড়ে এল, 'কই মামা? কি এনেছ? দাও না!"

মামা বললেন, 'মার কাছে দেখ গিয়ে কেমন সুন্দর পুতুল এনেছি।' হিংসুটি উৎসাহে নাচতে লাগল, মাকে বলল, 'কোথায় রেখেছ মা?' মা বললেন, 'আলমারিতে আছে।' শুনে ভয়ে হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে উঠল। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'সেটার কি লাল জামা আর লাল জুতো পড়ানো—মাথায় কালো কালো কোঁকড়ানো চুল ছিল?' মা বললেন, 'হ্যাঁ—তুই দেখেছিস নাকি?'

হিংসুটির মুখে আর কথা নেই! সে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তারপর একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এর পরে যদি তার হিংসে আর দুষ্টুমি না কমে, তবে আর কি করে কমবে?

অঙ্কন : *সুদীপ্ত ভাণ্ডারী*

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব উপেন্দ্রকিশোর রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমারের জন্ম ১৮৮৭ সালে। ১৯০৬ সালে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন দুই বিষয়েই সাম্মানিক (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। পড়াশুনা করেন লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারে। ১৯১৩ থেকে উপেন্দ্রকিশোর ছোটোদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' প্রকাশ করেন। দেশে ফেরার পর ১৯১৫ সালে বাবার মৃত্যু হলে সুকুমার সন্দেশের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকার পাতাতেই সুকুমার রায়ের বেশিরভাগ ছড়া, কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তার বাড়িতে বিখ্যাত মানডে ক্লাবের (সোমবারের সাহিত্য আড্ডা) আড্ডায় বহু বিখ্যাত মানুষ যোগ দিতেন। দীর্ঘ আড়াই বছর কালাজ্বরে ভুগে ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মাত্র ৩৬ বছর বয়সে গড়পার রোডের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। আবোলতাবোলের 'ডামি' কপিটিও তিনি রোগশয্যায় শুয়েই তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেটি প্রকাশ হওয়ার মাত্র ন'দিন আগে তিনি প্রয়াত হন। উল্লেখ্য, 'অতীতের ছবি' ছাড়া তাঁর কোনো লেখাই জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় নি। 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র'-এর প্রথম খণ্ড ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।

তথ্য মাণিক ...

(২ পাতার পর)

২৩ সেপ্টেম্বর সেনেট হলে বাংলাদেশের তরুণ সাহিত্যিকরা সত্যজিৎ ও ছবির শিল্পী কলাকুশলীদের সম্বর্ধনা জানায়।

১৯৫৬ কান চলচিত্র উৎসবে পথের পাঁচালী 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক আবেদন সম্পন্ন চলচ্চিত্র' হিসাবে সম্মান লাভ করে।

১৯৫৮ ব্রাসেলস্-এ বিশ্বের সাতজন সেরা পরিচালক দ্বারা দশটি সেরা ছবি নির্বাচন প্রতিযোগিতায় বিচারক।

১৯৫৯ সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। পদ্মশ্রী।

১৯৬০ নভেম্বর, মাতা সুপ্রভা রায়ের মৃত্যু।

১৯৬১ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ। বাংলায় সাহিত্য রচনা শুরু।
বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান।

১৯৬৫ নভেম্বরে প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'প্রোফেসর শঙ্কু' প্রকাশিত।
পদ্মভূষণ উপাধি লাভ।
নভেম্বর সংখ্যার 'সন্দেশ'-এ প্রথম 'ফেলুদা' প্রকাশিত।

১৯৬৭ 'প্রোফেসর শঙ্কু' বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু

সাহিত্য গ্রন্থ হিসেবে আকাদেমি পুরস্কার।

১৯৬৯ ৮মে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' মুক্তি পায়।
সেপ্টেম্বরে প্রথম ফেলুদা গ্রন্থ 'বাদশাহী আংটি' প্রকাশিত।

১৯৭১ সাহিত্যে 'আনন্দ পুরস্কার' (সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার) লাভ।
যুগোশ্লাভিয়া সরকারের বিশেষ সম্মান।

১৯৭৩ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর অফ লেটারস্'।

১৯৭৪ লন্ডনের 'রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস'-এর 'ডক্টরেট' উপাধি।
বিশ্ববিখ্যাত 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' গ্রন্থে নাম অন্তর্ভুক্ত।

১৯৭৫ 'ব্রিটিশ ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটি' তাঁকে 'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক' রূপে সম্মান জানায়।

১৯৭৬ পদ্মবিভূষণ উপাধি।
প্রকাশিত হয় প্রথম ইংরেজি গ্রন্থ 'আওয়ার ফিল্মস্ দেয়ার ফিল্মস্'।

১৯৭৭ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়'-এর আমন্ত্রণে 'নর্টন লেকচারস্' দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা।

১৯৭৮ ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি লিট' প্রদান।
বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধি দান।
'বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি' তাঁকে 'সর্বকালের তিনজন সেরা পরিচালকের অন্যতম' রূপে সম্মান জানায়। অপর দুজন হলেন চার্লি চ্যাপলিন ও ইঙ্গমার বার্গম্যান।

১৯৮০ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি লিট' প্রদান।

১৯৮১ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান।
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি লিট'।
'একেই বলে শুটিং' গ্রন্থটির জন্যে 'শিশু সাহিত্য পরিষদ' বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সত্যজিৎকে 'ফটিক স্মৃতি পুরস্কার' দেয়।
'শিশিরকুমার সাহিত্য পুরস্কার' অর্জন।

১৯৮২ শিশু সাহিত্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' অর্জন।

১৯৮৩ ২৯ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত।

১৯৮৪ ১২ জুন চিকিৎসার প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিউস্টন যাত্রা।
১৪ আগস্ট কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

১৯৮৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' উপাধি।
'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার'-এ সম্মানিত।
ভারতীয় ও বিশ্ব চলচ্চিত্রে বিশিষ্ট অবদান, বিশ্ব শান্তির উন্নতি সাধন এবং ভারত-রাশিয়া সম্প্রীতির জন্যে 'সোভিয়েত দেশ-নেহরু পুরস্কার' অর্জন।

১৯৮৭ ফরাসি সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয়ন অফ অনার'-এ সম্মানিত।

সবার সত্যজিৎ

(২ পাতার পর)

'অ্যাবস্ট্রাকসন' নামে একটি ইংরেজি গল্প লেখেন সত্যজিৎ। এই তথ্যটি আমাদের প্রায় অনেকেরই অজানা।

সত্যজিৎ যা লিখেছেন তার সঙ্গে হয়তো বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষপ্রসঙ্গ

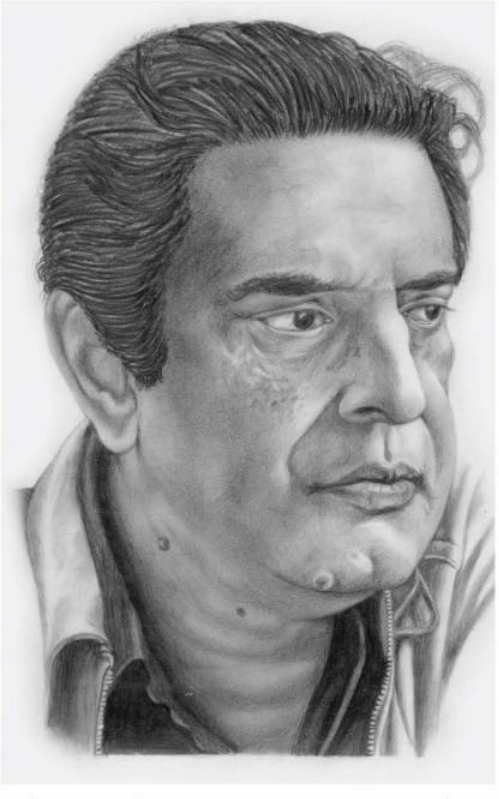

অল্পই। প্রায় সবই গোয়েন্দা গল্প, কল্পবিজ্ঞান কাহিনি, ভূত-প্রেত-অলৌকিকতা এবং রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। সত্যজিতের লেখার মধ্যে ৩৩টি ফেলুদা, ৩৮টি শঙ্কু, ফটিকচাঁদ, এবং ৬০টির বেশি অন্যান্য গল্প রয়েছে। এছাড়াও যেসব চলচ্চিত্র তাঁর নিজের গল্পের ওপর দাঁড়িয়ে, যেমন - কাঞ্চনজঙ্ঘা ও শাখা-প্রশাখার চিত্রনাট্য, মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প, বেশ কিছু প্রবন্ধ, নিজের এবং অন্যের চলচ্চিত্রে যেসব গানের কথা, বেশকিছু অনুবাদ তিনি করেছেন। শিশুদের তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের মতোই তিনি গুরুত্ব দিতেন। একবার রবি ঘোষকে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, "দ্যাখো তোমাকে একটা কথা বলে দিই। বাচ্চাদের যখন ট্রিট করবে কখনো বাচ্চাদের মতো করবে না। ওদের একেবারে অ্যাডাল্ট হিসেবে ট্রিট করবে। কারণ বাচ্চাদের মতো ট্রিট করতে গেলেই ওরা কিন্তু চটে যায়।"

একটা কথা সকলেই মানবেন যে ছোটোদের সব সাহিত্যই বড়োদের, বড়োদের সব কিছু কিন্তু ছোটোদের জন্য নয়। সত্যজিৎ রায়ের একটা সাক্ষাৎকারের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল– *ফেলুদার গল্প ছোট-বড় সকলেই পড়ে– কিন্তু সেভাবে ফেলুদার গল্পে কোনো বয়স্ক উপাদান নেই। কেন?....*

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, *"কথাটা ভুল। বয়স্ক উপাদান না থাকলে ছোট-বড় সকলেই ফেলুদার গল্প পড়ত না। আমার যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে তবে সে হল এই দুই উপাদানের সংমিশ্রণ। তবে এমন কোনো*

ফেলুদার উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আমার নেই যাতে শুধুই বয়স্কদের জন্য উপাদান থাকবে।" (***টেলিভিশন পত্রিকা***, আগস্ট '৯০)

শুধু ফেলুদা নয়, সবসময় ছোটোদের কথা মাথায় রেখে সত্যজিৎ রায় লিখতেন বলেই সব গল্প সম্পর্কে তাঁর একই উত্তর অনুমান করা যায়। টেলিভিশন পত্রিকার প্রশ্নকর্তার প্রশ্নটাও ঠিক, আবার উত্তরটা আরোই ঠিক। ছোটোদের জগতে অবাধ তাঁর বিচরণ, অন্যদিকে ছোটোরাও তাঁর লেখা নিজেদের মতো করে বুঝে নিতে পারে। পাশাপাশি রচনাগুলিতে এমন জায়গা রয়েছে যেখানে বয়স্করাও গভীরে প্রবেশ করতে পারেন। কিছুটা হয়তো বিতর্ক এড়াতেই সত্যজিতের গল্পে মেয়ে চরিত্র প্রায় নেই-ই। কিন্তু মেয়ে পাঠকেরা তার জন্য কোনোদিন আপত্তি তোলেননি। পাশাপাশি তথাকথিত 'হরর' বা বীভৎসতা থেকেও তাঁর লেখা সযত্নে দূরে থেকেছে। এই পরিস্থিতিতে সত্যজিৎ ছোটোদের জন্য লেখা লিখেছেন। ছোটোদের নাম করে বড়োদেরও খুশি করার অনেকখানি দায়িত্ব নিয়েছেন। সবার মনের মতো করে লিখে সত্যজিৎ সাম্প্রতিক কালের ছোটো বা বড়ো সব পাঠকদের কাছে অপরিহার্য হয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি আবেগকে সরিয়ে বুদ্ধিকে জায়গা করে দিয়েছেন। খাঁটি বাঙালিয়ানাতেই তুলে ধরেছেন বিশ্বকে।

> "রবি ঘোষকে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন,"দ্যাখো তোমাকে একটা কথা বলে দিই। বাচ্চাদের যখন ট্রিট করবে কখনো বাচ্চাদের মতো করবে না। ওদের একেবারে অ্যাডাল্ট হিসেবে ট্রিট করবে। কারণ বাচ্চাদের মতো ট্রিট করতে গেলেই ওরা কিন্তু চটে যায়।"

বাড়িতে সাজানোর জিনিস নয়

পেটসেটরা

(গত সংখ্যার পর)

পাখি পোষা। 'পেট' বা পোষ্য হিসেবে পাখি মন্দ নয়, বরং বলা চলে ভালই। কিন্তু পোষ্য হিসেবে পাখিকে বাছার আগে তোমাদের কিছু বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে। গত সংখ্যায় পাখি পোষা সম্পর্কে ৬টি উল্লেখযোগ্য বিষয় বলেছিলাম। এই সংখ্যায় বাকি ৪টি 'পয়েন্ট' বলছি।

৭) পাখি খুব ছোট্ট জায়গায় রাখা সম্ভব। বুঝতেই পারছো আজকের দিনে বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে জায়গার অভাবের সময় যদি তুমি বা তোমরা কোনো ছোটো প্রজাতির পাখি পোষার জন্য মনস্থির করো তাহলে তার থেকে ভালো কিছু হয় না। কিন্তু মনে রাখবে, ছোটো পাখির থাকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি। তাই যদি তুমি দিনের বেলায় ঘরে পাখিটিকে ছেড়ে রাখো তাহলে ছোটো খাঁচাটিতে রাতে ঘুমোতে পাখি কোনো আপত্তি করবে না। সবথেকে বড়ো কথা, সারাদিন খাঁচায় বন্দি করে রাখা কোনো পাখির কাছেই স্বাস্থ্যকর নয়। একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, যতটা বড়ো সম্ভব খাঁচাই পাখির জন্য বরাদ্দ করা উচিত, তোমার বাড়ির কোনো এক কোণায় যে খাঁচা ধরবে সেই মাপের খাঁচা পাখির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।

৮) কুকুর বা বেড়ালের মতো পাখি সাধারণভাবে কোনো ক্ষতি করে না। স্বাভাবিক কারণে পাখি পোষার ঝামেলা অনেক কম। কিন্তু মনে রাখা দরকার, যদি তোমার পোষ্য পাখিটি আকারে বড়ো হয়, তাহলে পটি করে নোংড়া করাতেও সে ওস্তাদ হবে। এছাড়া পাখির কিচিরমিচিরে অনেকের অস্বস্তি বা ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে (যদি কোনো ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকো)।

৯) পাখি খুবই আকর্ষণীয়। অনেক পাখিই খুব সুন্দর দেখতে, রঙিন পালকে সারা গা মোরা থাকে। ফলে পাখি দেখলেই মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। শুধু তাই নয়, পাখির আচরণও বেশ মজার। এদের মজার আচরণ দেখলে শরীরে 'স্ট্রেস' কমে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার পাখি কিন্তু বাড়িতে শুধুই সাজিয়ে রাখার মতো কোনো বস্তু নয়। যথেষ্ট মনোযোগ ও যত্ন পাখিদের প্রয়োজন। কোনো ক্ষেত্রে বাড়ির অন্যান্য পোষ্যদের থেকেও বেশি মনোযোগ পাখি দাবি করে।

১০) অনেক পাখি বহু বছর বাঁচে। স্বাভাবিক কারণেই অন্যান্য পোষ্যদের তুলনায় বাড়িতে প্রতিটি কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যায় পাখি। বয়স্ক মানুষদের জন্য দীর্ঘজীবী পাখি খুবই ভালো। কারণ পোষ্য হারানোর দুঃখ তাঁদের বইতে হয় না।

(পরের সংখ্যায় কোন পাখি পুষবে)

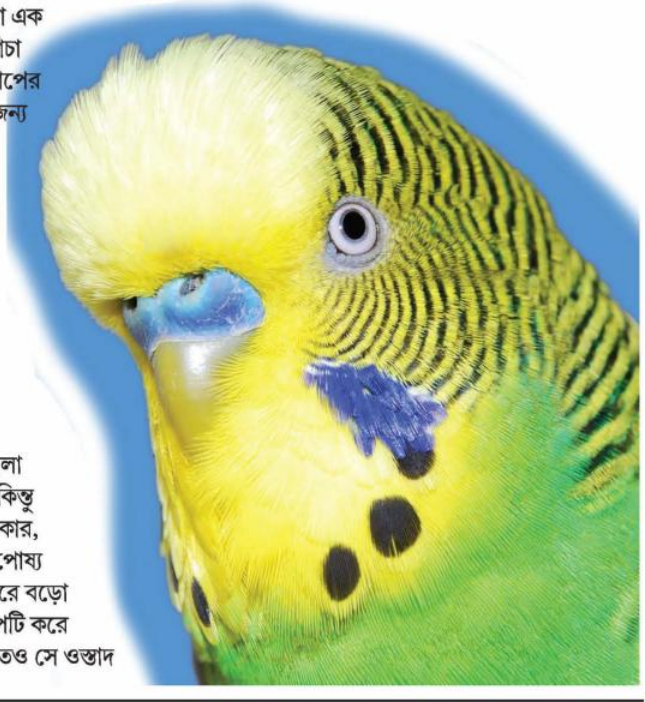

ইচ্ছেডানা

স্বপ্না ভট্টাচার্য

তোমার মতো ছোট্ট ছিলাম
ছোট্ট ছিলাম যখন
বড়ো হয়ে, ভাবতুম, ঠিক
হব মায়ের মতন।

যখন তেমন বড়ো হলাম
অনেকখানি বদলে গেলাম
মন খারাপের দিনগুলো ঠিক
শুরুই হল তখন -
বড়ো হয়ে হয়ে গেলাম
মায়ের মতো যখন।

ছোট্টবেলায় গ্রাম, গাছপালা
ছবির মতো আসে।
চু-কিত্-কিত্, লুকোচুরি
মুখ টিপে আজ হাসে।
নেইতো সেই মায়ের কোলে
মাথা রেখে শোয়া -
ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমীরা
সব হয়েছে হাওয়া!
ভালো ছিল ইস্কুল আর
চু-কপাটি খেলা -
যখন ছিল এতো কিছু
সব করেছি হেলা।

আজকে যখন বড়ো হয়ে
মায়ের মতো হলাম
ইচ্ছেডানায় ভর করে ফের
শিশুই হয়ে গেলাম।

বড়ো, ছোটোরা

পার্থ বসু

বড়োরা হুল ফোটাতে ব্যগ্র যত
ততটা ফুল ফোটাতে উৎসাহী নন
বক্রনজর।
বড়োদের দল পাকাতে যে আগ্রহ
ততটাই ফল পাকাতে নিষ্ঠাবিহীন
অধৈরজ।
বড়োরা টাকার জন্য ব্যস্ত যত
নিরাপদ থাকার জন্য গর্ত খোঁজেন
বোঝেন না যা
সেখানে থাকতে পারে বিষাক্ত সাপ
সপাটে রাখতে পারে একটি ছোবল
কিংবা হাজার
বিপদও অন্য আরও দাঁতকপাটি
অথবা বন্য আরও হিংস্র শ্বাপদ
বুঝতে নারাজ।
বড়োরা পাল্টি খেতে পারে একটি ছোবল
কিংবা হাজার
বিপদও অন্য আরও দাঁতকপাটি
অথবা বন্য আরও হিংস্র শ্বাপদ
বুঝতে নারাজ।
বড়োরা পাল্টি খেতে পারেন যত
ততটাই গালটি খেতে অসম্মত
ছন্নছাড়া।
বড়োরা বোদ্ধা ভাবেন তাও নিজেদের
তার উপর যোদ্ধা ভাবেন, বিপদ আপদ
আনেন ডেকে।
বড়োরা ছোটোর কাছে শিখুন বরং
বড়োরা ছোটোর হাতেই দিন তুলি রঙ
ভরসা রেখে
বড়োরা দিন তার হাতে সমস্ত ভার
শত দুর্দিন তাড়াতে ওই ছোটোরাই
পারবে জানি
বড়োরা হাসতে শিখুন ছোটোর মতো
আর ভালবাসতে শিখুন আসল সোনা
মুক্তো মানিক।

দ্বীপের নাম কুতুবদিয়া

রত্নেশ্বর হাজরা

হাতানিয়া দোয়ানিয়া - তারপরে দ্বীপ কুতুবদিয়া
দেখতে গিয়ে একটা টিয়া
ভিরমি খেয়ে পড়ল বালুর চরে
দারুণ ভয়ে
খুন্তে বগার লম্বা ছোঁটে বলল, টিয়া ওঠ রে ওঠ
গুনছি আমি এক দুই তিন ...
উঠল টিয়া ৯-এ।
কী রে টিয়া হল কীটা! খেলি কেন এ ভিরমিটা?
বলল টিয়া, ভয়ে দারুণ ভয়ে -
হাসল টিয়া খিক খিক খিক খি
আগে এমন দ্বীপ দেখেছিস কি?
চারদিকে জল-জল শুধু জল
জল ছাড়া আর কিছু হয় না জ-এ।
আমার হবে এই ন'বচ্ছর দ্বীপের চরে বেঁধেছি ঘর
আমার কি আর ডর লাগে এইখানে -
জল দেখে ভয় পেয়েছিস ঠিক
ভয় পাওয়া তোর খুব স্বাভাবিক
তোর যে বসত গাছপালার উদ্যানে।

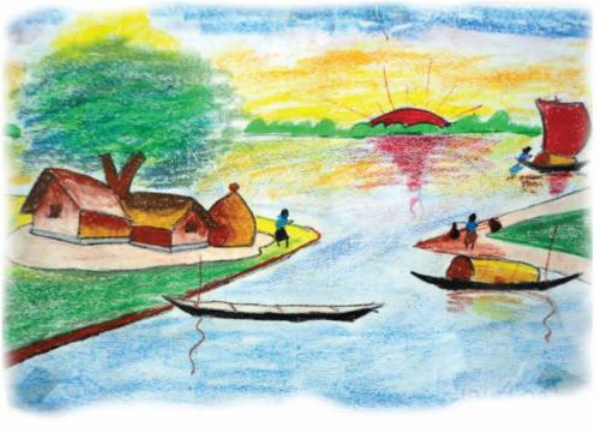

শুধু স্বপ্ন নয়

হারাধন সাহা

ভুলভ্রান্তি নয়কো কিছুই খেলাধুলার ছল
আকাশ ভরা সূর্য-তারা কেন ওমন বল,
রাগী রাগী সুয্যিমামা স্নিগ্ধ শীতল চাঁদ
আড়ংঘাটার পাখ-পাখালি নিকষ কালো রাত;
সকালবেলার দিঘীর জলে মায়ের চোখের জল
উদাস বাউল গান গেয়ে যায় চরে গরুর দল।
সেগুন, পারুল, জারুল ছায়া বাব্লা গাছের সারি
হারিয়ে যায়, মন ছুটে যায়, সাধের ভাঙা বাড়ি।

এক পেয়ালা, দু'পেয়ালা কাপ যে সারি সারি
রহিম, রবীন, যতীন, সতীশ এক্কাদোক্কায় পাড়ি,
ডাংগুলি আর ঝুপ করে ডুব চূর্ণীনদীর জল
গলির মোড়ে বালতি হাতে পৌরসভার কল;
ব্যপ্ত ব্যপ্ত মানুষ ছল অচিনপুরের গায়
ঘুম জোড়া চোখ বুজে আসে ফুটপাথের বিছনায়

স্বপ্ন চলে, স্বপ্ন হাসে, স্বপ্ন শুধু বাঁচে
দোয়েল, কোয়েল, ফিঙে-শালিক কোলের ওপর কাচে,
হাতের কাছেই স্বপ্ন-বাড়ি, ঝাঁ চকচকে গাড়ি,
স্বপ্নের বই, খোলা আকাশ, স্বপ্নের ভাতের হাড়ি
মায়ের আশা, ভালোবাসা, আদর মাখা হাত
ঘুমোয় খোকা, শহর, দোকান ঘুমোয় ফুটপাথ।

সিধু জ্যাঠারও কাগজ কাটিংয়ের হবি ছিল

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

'হবি' কত রকমের যে হতে পারে তার গোনাগুনতি নেই, ডাকটিকিট জমানো কিংবা দেশ-বিদেশের টাকা পয়সা জমানো - এসব তো অনেকেরই জানা, অনেকেই করে। কেউ বা বাস-ট্রামের টিকিট জমিয়ে মজা পায়। কেউ কেউ বা দেশ-বিদেশের দেশলাই বাক্সও সংগ্রহ করে। কেউ নামী শিল্পীদের ছাপা ছবি সংগ্রহে রাখে। ছোটোবেলা থেকেই হবির অভ্যেসটা গড়ে ওঠা ভালো। ভালো বলেই বাবা-মায়েরাও যুগিয়ে যায় উৎসাহ। কোনো একটা কাজে মন দিয়ে লেগে থাকার অভ্যেস গড়ে উঠলে, সে মনটা অন্য কাজের বেলাতেও কাজে লাগে। তোমাদের যার যেমন ভালো লাগে, সেই ভালো লাগাতেই হবি-র অভ্যেসটা গড়ে ওঠে। তোমরা সেই ভালো লাগায় সংগ্রহ করতে পার নানান জিনিস। আমরা কেবল এখানে তোমাদের যুগিয়ে যাব কাজটা করার, ঠিক ঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নিয়মকানুন। এবারে থাকছে - **খবরের কাগজ কাটিং**

কাটিং বা ক্লিপিংস কী করে করতে হয়, তা নিয়ে দু-চার কথা বলি। গোটা কাগজ নয়, কাগজের ভেতরের যে বিষয়টা তোমার ভালো লাগে, সেই বিষয়ের কাটিং প্রত্যেকদিন জমিয়ে একটি অসাধরণ আকর বা 'রেফারেন্স' খাতা তৈরি করে ফেলা যায়। যেমন - খেলাধুলো, দুর্ঘটনা, অভিযান, বিশ্বখ্যাত মানুষদের মৃত্যু সংবাদ বা পুরস্কারের খবর, জীবনী এমনকি কার্টুনও জমানো যেতে পারে।

কী কী প্রয়োজন

১। স্ক্র্যাপবুক বা সাদা খাতা। খাতাটা একটু বড়ো হলে ভালো হয়। আজকাল দোকানে ভিন্ন রঙের 'ফুলস্কেপ' মাপের স্ক্র্যাপবুক কিনতেও পাওয়া যায়।

২। কাঁচি।

৩। আঠা। গঁদ নয়, ফেভিকল জাতীয় আঠা জলে গুলে ব্যবহার করলে নিউজ প্রিন্টে দাগ হয় না।

৪। পেন বা পেনসিল। ডট্ পেন চলতে পারে কিন্তু ফাউন্টেন পেন বা 'জেল' কালির পেন নয়।

কী করতে হবে?

প্রতিদিন না হলেও, সপ্তাহে একদিন সাতদিনের কাগজ নিয়ে কেটে ফেলতে হবে। প্রতিটি কাটিং, খাতায় আটকে অবশ্যই কাগজের নাম ও তারিখ লিখে রাখা প্রয়োজন। ইচ্ছে করলে কাটিংয়ের পাশে নিজের মন্তব্য লিখে রাখা যায়। কাটিং আটকাতে হবে খাতার একদিকে, মানে ডান দিকের পাতায়।

আজ থেকেই লেগে যাও। মনে আছে তো ফেলুদার কিছু জানতে হলে কার সাহায্য নিতে যেত? হ্যাঁ, সেই সিধু জ্যাঠারও এই খবরের কাগজের কাটিং জমানোর 'হবি' ছিল।

রবিঠাকুরের পড়াশুনা

(৬ পাতার পর)

গানটি। সেই সালেই 'জ্ঞানাঙ্কুর' এবং 'প্রতিবিম্ব' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 'বনফুল কাব্য'। ১৮৭৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ তথা গদ্যরচনা করেন। সেই প্রবন্ধে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী', ও 'দুঃখসঙ্গিনী' কবিতার বইয়ের সমালোচনা করেন। সেখানে 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', 'আইরিশ মেলোডিজ' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। এই রচনা দেখে সহজেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ খুব কম বয়সেই বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত তিন ধরনের বই-ই পড়েছিলেন। এই গদ্যরচনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সেই কিশোর বয়সেই বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, শেক্সপিয়ার, মিলটন, বায়রন, মুর, লাল্লারুখ, কালিদাস, জয়দেব পড়েছিলেন তা বোঝা যায়।

এর ঠিক পরেপরেই ১৮৭৭ সালের শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন 'ভারতী' পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ সেই উপলক্ষে লিখেছেন, "মেঘনাদবধ কাব্যের দাম্ভিক সমালোচনা দিয়া আমি 'ভারতী'তে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম, (ভাদ্র, ১২৮৯)।" এই সমালোচনার মধ্যে বহু বই যে রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সেই পড়ে ফেলেছিলেন তা বোঝা গিয়েছে। ভারতী'র প্রথম দুটি সংখ্যায় 'ভিখারিনী' গল্পটি প্রকাশিত হল। পরবর্তী আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম তথা অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয়। এছাড়া ভানুসিংহের পদাবলী, ধারাবাহিক 'কবি কাহিনী'ও ভারতীতে প্রকাশিত হয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত কী কী বই পড়েছিলেন তার একটা আভাস তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। মনে রাখবে, ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্রই ১৭ বছর। তবে আমি বলবো, রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর সম্বন্ধে জানতে তাঁরই লেখা 'ছেলেবেলা' এবং 'জীবনস্মৃতি' বইদুটির কোনো বিকল্প নেই। তোমরা অবশ্যই বই দুটি সংগ্রহ করে পড়ে নেবে।

আতঙ্ক নয়, অঙ্ক

গত সংখ্যায় ট্রাখটেনবার্গ কীভাবে ১১ দিয়ে গুণ মুখে মুখে করার পদ্ধতি খুঁজে পেলেন সেই বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছিলাম গুণফলের প্রথম অঙ্ক পর্যন্ত ট্র্যাখটেনবার্গ একটা সূত্র বার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরের অঙ্কগুলো কীভাবে পাওয়া যাবে? কিছুক্ষণ হিসাব-নিকাশ করেই সেই সূত্রও বার করে ফেললেন তিনি। ট্রাখটেনবার্গ দেখলেন গুণফলের দ্বিতীয় অঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে গুণনীয়র প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফলের মাধ্যমে। অর্থাৎ ৫৪-এর বেলা প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক যোগ করে ৯ এবং ৭৬-এর ক্ষেত্রে ৭ এবং ৬ যোগ করে ১৩-র ৩ আর হাতে থাকছে ১। গুণনীয়র শেষ অঙ্কটাই বসবে গুণফলের শেষ অঙ্ক হিসেবে। অবশ্য হাতে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা যোগ হবে। সুতরাং ৫৪-এর ক্ষেত্রে হবে ৫ এবং ৭৬-এর ক্ষেত্রে হবে ৮ (শেষ অঙ্ক ৭ ও হাতে থাকা ১ যোগ করে প্রাপ্ত)।

এবার ট্র্যাখটেনবার্গ আর একটু বড় সংখ্যা নিলেন। ধরা যাক ৬৩৫। ৬৩৫x১১ - প্রথম অঙ্ক ৫। গুণফলের দ্বিতীয় অঙ্ক ৫+৩=৮, তৃতীয় অঙ্ক ৬+৩=৯। চতুর্থ অঙ্ক ৬। অর্থাৎ ৬৩৫x১১=৬৯৮৫।

আর একটু বড়ো সংখ্যা নিয়ে দেখা যাক। এবার ২৭৮৩x১১

প্রথম সংখ্যা - ৩

দ্বিতীয় সংখ্যা - (৮+৩=১১)-র ১, (হাতে থাকল ১)

তৃতীয় সংখ্যা - (৭+৮=১৫)-র ৫+১ (হাতে থাকা ১ যোগ হল এবং হাতে আবার থাকল ১) = ৬

চতুর্থ সংখ্যা - {(৭+২=৯)+১}= ১০-এর ০ (হাতে থাকলো ১)

পঞ্চম সংখ্যা - ২+১=৩

অর্থাৎ গুণফল ২৭৮৩x১১=৩০৬১৩।

এবার তাহলে তোমরা কিছু গুণ করে অনুশীলন করে দেখো। কেমন লাগলো জানাতে ভুলবে না কিন্তু। পরের সংখ্যায় আমরা সংখ্যা নিয়ে আরো মজার কিছু জানবো।

আসল কথা

(৫ পাতার পর)

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দুজন রাজকর্মচারী ভেতরে ঢুকে পড়লে। সম্রাটকে বলল, 'মাফ করবেন হজুর আপনার নিদ্ খারাপ করার জন্য। কিন্তু জানালা খুলে শোবেন না। চারদিকে শত্রু গিজগিজ করছে। আপনি পাখাওয়ালাদের ছুটি কেন দিলেন?

'সে কৈফিয়ৎও কি তোমাকে দিতে হবে? যাও এখান থেকে।'

'আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন হজুর। আমরা আপনার শিয়রে পাহারা দিচ্ছি আপনি নিদ্ যান আরামসে।'

'এই নিকালো আভি! জলদি।'

সম্রাটের রুদ্রমূর্তি দেখে দুই বডিগার্ড ভয় পেয়ে দৌড়তে শুরু করে। দরজাটা বন্ধ করে দেন সম্রাট। বিছানায় সবে বসেছেন এক গ্লাস জল খেয়ে।

'হুজুর জানালা বন্ধ করে শোবেন দয়া করে।' সেই বডিগার্ড দুটোর একটার মাথা জানালায় দেখা যায়। সম্রাট রেগে গিয়ে হাতের ভারি গ্লাসটাই জানালা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন। দুজন প্রহরীকে তাড়ানোর জন্য তিনি গ্লাস ছুঁড়েছিলেন কিন্তু সেই আওয়াজে যতজন প্রহরী ছিল প্রায় প্রত্যেকেই দৌড়ে আসে। সম্রাট সবাইকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি ঠিক আছেন। প্রত্যেককে বিদায় জানিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। জানালা বন্ধ করতে ভোলেননি। গভীর রাতে জানালায় টোকা। ছোরাটা হাতে নিয়ে খুব সাবধানে একটা পাল্লা খুললেন সম্রাট। তরোয়ালটা কোথায় খুঁজে পেলেন না। জানালায় আর একজন রাজপ্রহরী।

'কী ব্যাপার! তুমি আবার কে? এত রাতে বিরক্ত করছ?'

'হুজুর ঠিক আছেন কিনা দেখতে এলাম। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো আপনি ঠিক আছেন কিনা।'

'আমি জানালা খুলে শুচ্ছি তুমি বাইরে থেকেই দেখতে পাবে।'

'না হুজুর তা করবেন না। চারদিকে শত্রু আপনার গিজ গিজ করছে।'

'তুমি ঠিক বলেছো প্রহরী। চারদিকে শত্রু গিজগিজ করছে। মাস মাহিনা দিয়ে একদল শত্রুই পুষেছি।' বলেই জানালা বন্ধ করে দেন। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু আবার তাঁকে উঠতে হল। দরজায় ধাক্কা পড়ছে। সম্রাট জোব্বা গায়ে চাপিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে দরজা খুললেন, এবার ছোরাটাও খুঁজে পেলেন না। সামনে একজন পরিচারিকা।

'গুস্তাফি মাফ করবেন হজুর। আপনার পানীয় জল লাগবে?'

'এই জানতে এসেছো এত রাতে?"

'আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো? যোধা বেগম সেই জন্যই পাঠালেন আমাকে। আপনার সুগন্ধী ধূপ লাগবে হুজুর? মশা কামড়াচ্ছে না তো আপনাকে?'

'না, তুমি যাও তো।'

'আপনার হাত পাখাওয়ালার ডিউটি বদল হবে এখন।'

'তুমি যদি না এখনই যাও তাহলে তোমার ডিউটি আর থাকবে না।'

দরজাটা মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়ে সম্রাট চোখ বুজলেন। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। একটু পরেই আজানে বসতে হবে।

সকাল হতেই সম্রাট পারিবারিক সভা ডাকলেন। দুই মা আর দুই বেগমের সামনে ঘোষণা করলেন যে তিনি যুদ্ধে যেতে চান। এখন তাঁকে সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিতে হবে। আপাতত বেশ কিছুদিন লম্বা ট্যুর। যুদ্ধের পর চিস্তি সাহেবের দরগায় যেতে হবে। শুধু দরবার আর অন্তঃপুর করলে কিছুই হাসিল হবে না। আর তারপরের ইতিহাস তো গোটা বিশ্ব জানে। আসল কথাটা যার জন্য সম্রাট যুদ্ধে গিয়েছিলেন সেই কথাটা শুধু জানতাম আমি, আজ ফাঁস করে দিলাম তোমাদের কাছে।

আসল কথা

সহেলী চট্টোপাধ্যায়

সম্রাট আকবর ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করছেন। আর বারবার যোধার দিকে তাকাচ্ছেন। যোধা ঠাকুরঘরে পুজো করছেন। দূর থেকে তাঁর ভজনের মিষ্টি সুর সম্রাটকে মুগ্ধ করল। কিন্তু মন দিতে পারলেন না বেশিক্ষণ। খুব যে দরকার যোধাকে। আজ কিছু না ভেবেই ঢুকে পড়লেন যোধার মহলে। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে সুরেলা কণ্ঠ ককর্শ কণ্ঠে পরিণত হল। 'কতবার বলেছি না জুতো পরে আমার ঠাকুর ঘরে ঢুকবে না। পুরো ভজনটাই মাটি করে দিলে! অ্যাই কে আছিস, গঙ্গাজলের ঘটিটা নিয়ে আয়।'

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে সম্রাটের কান। দাসীদের মধ্যে মুচকি হাসি খেলে গেল স্পষ্ট দেখলেন। না হয় ভুল একটা করেই ফেলেছেন, তার জন্য এত চিৎকার! যোধা প্রায় খালি করে ফেললেন গঙ্গাজলের ঘটি। সম্রাটও প্রায় স্নান করে গেছেন। যোধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই অসময়ে কেন দরকার পড়ল?'

'কিজন্য এসেছিলাম তা আর মনে পড়ছে না। তুমি এমন রে রে করে উঠলে ...!'

'চমৎকার! কী অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। বাদাম দিয়ে দুধের শরবত খাও।'

'আর দুধের শরবত! আগে তোমার ঘোল হজম হোক।'

'আমি আবার কখন ঘোল খাওয়ালাম তোমায়?'

'রোজই তো খাওয়াচ্ছো।'

'ইস! তোমার স্মৃতি দেখছি একদমই নষ্ট হয়ে গেছে।' যোধা মালা গাঁথতে গাঁথতে বললেন।

সম্রাট উঠে পড়লেন। এতক্ষণ বসেছিলেন। বললেন, 'যাই দেওয়ানি খাসে আজ বসতে হবে। দেওয়ানি খাসে বসেও মনে করার চেষ্টা করলেন ঠিক কি কারণে যোধার কাছে গিয়েছিলেন। দুপুরে বিরতির আগে মনে পড়ল হঠাৎ। তাঁর সেই নীল রঙের প্রিয় জোব্বাটার হাতার কাছে একটু ছিঁড়ে গেছে। আর সেইজন্যই যোধাকে দরকার ছিল। কিন্তু এমন মুখ করল! যাক গে; কিন্তু সেই ছেঁড়া জোব্বাটাই তো তিনি পড়ে আছেন। সবাই নিশ্চয় দেখে ফেলেছে যে সম্রাট ছেঁড়া জোব্বা পড়ে সভায় এসেছেন। কী লজ্জা! একটু পরেই মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টা বেজে উঠবে। সম্রাট আগেই সভা ভঙ্গ করলেন। এরপরে দেওয়ানি-আমের মিটিং আজ বন্ধ রাখবেন। শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে মুলতুবি রাখলেন সভা। দুপুরে খাওয়ার পর রোকেয়া বেগমের মহলের দিকে পা রাখলেন, আকবরের আর এক বেগম। যদি রোকেয়া সেলাইটা করে দেয়। এই জোব্বাটা তাঁর ভীষণ প্রিয়। তাই মনটা আরও খচখচ করছে। রোকেয়া বেগমের মহলের সামনে সম্রাট এসে দাঁড়ালেন। রাজপ্রহরী সবে ঘোষণা করতে শুরু করেছে তাঁর আগমনবার্তা। সম্রাট তাকে থামিয়ে দিলেন- 'চুপ করো তো। যাও এখন।'

রোকেয়া বেগম পালঙ্কে বসে পান সাজছিলেন। সম্রাট বললেন, 'আমার একটা ছোট্ট কাজ করে দিতে হবে। এই জোব্বার হাতার কাছে একটু ছিঁড়ে গেছে। একটু সেলাই করে দাও।'

'রেখে যাও পরে সময় পেলে করে দেব।'

'এখনই দাও না গো।'

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে জাঁহাপনা। বিরক্ত কোরো না।'

'একটা পান দাও তো।'

সম্রাট হাত বাড়াতে যান। পানের ডিবে সরিয়ে নেন রোকেয়া বেগম, 'পান নেই গো। ও বেলা বাজার থেকে আনিয়ে দিও, তারপর সেজে দেব।'

'ওই তো অনেকগুলো পান দেখতে পাচ্ছি।'

'ও সব আমার আর দাসীদের। তুমি খেতে পারবে না।'

ঘরে এসে সম্রাট ভারী জোব্বাটা খুলে ফেললেন। রাজা-বাদশাহ হওয়ার এই অসুবিধা; গরমেও ভারী ভারী পোষাক পড়ে থাকতে হয়। নিজেই হাতপাখা নাড়তে নাড়তে শুয়ে পড়লেন। হাওয়া দেয় যে ভৃত্যটি তাকে ছুটি দিলেন আজ। বিকেলে কিছুক্ষণ বাগানে পায়চারি তারপর সন্ধেবেলা নাচগানের আসর। যোধা আর রোকেয়া বেগম দারুণ সাজগোজ করে এসেছে।

রাত্তিরে খাওয়ার পর প্রাসাদের ছাদে উঠলেন সম্রাট। পেছনে একটা লোক। সম্রাট হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে হে? আমার পেছনে পেছন কেন ঘুরছো?'

'আজ্ঞে, আমার কাজই হল আপনার সঙ্গে পায়চারি করা। এজন্যই আমি বেতন পাই।'

'কিন্তু তোমায় তো প্রথম দেখছি বলে মনে হচ্ছে।'

'বড় মানুষরা কি আর গরীব মানুষের মুখ মনে রাখে নাকি! কত দায়িত্ব আপনার কাঁধে।'

'আজকাল কিছুই মনে রাখতে পারি না। যোধা বেগম ঠিকই বলেছে। যাও তুমি। দরকার হলে ডাকব।'

'কিন্তু আপনাকে একা রেখে আমি যেতে পারব না।'

'কী! তুমি আমার আদেশ অমান্য করছ! দফা হয়ে যাও এক্ষুনি নইলে তোমার গর্দান যাবে।' লোকটি এরপর বিদায় নিল। প্রাসাদের ছাদে সহসা এক নারীমূর্তির আবির্ভাব হল। সেই নারীমূর্তি বলল, 'বেটা তুই এখানে একা একা বসে আছিস! গার্ডগুলো কই? সবকটাকে তাড়াচ্ছি কাল। এই রকম রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুষ্টু লোকেরা কত ক্ষতি করে দেয়।'

আকবর বুঝলেন দাই-মা মহাম আনগা। বললেন, 'দাই-মা আমিই ওদের যেতে বলেছি। আসলে একটু একা থাকতে চাইছিলাম।'

'কেন বেটা? তোমার মন খারাপ মনে হচ্ছে। না হলে রাতের অন্ধকারে এভাবে বসে থাকতে না।'

আকবর তাঁর মন খারাপের কারণ জানালেন। মহাম আনগা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন দুই বেগমের কথা শুনে। বললেন, 'এক্ষুনি ওদের বন্দী করার আদেশ দাও।'

'সেটা ভালো দেখায় না।'

'কিন্তু দেশের সম্রাটের সঙ্গে ওরকম বেয়াদপি করেও ওরা পার পেয়ে যাবে। লোকজন আর তোমায় মানবে না। ছিঃ ছিঃ! বাদশাহের আদেশ অমান্য করার চার্জ আনো। আর সেই সঙ্গে বাদশাহের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলা, তাঁর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করা; না-না, তাকে নিয়ে মজা করা; দাসীদের সামনে তাকে বিদ্রুপ করা - অনেকগুলো অভিযোগ আনা যায়।'

'আমার ছেলেটাকে কুশিক্ষা দিয়ে দিয়ে ওর সর্বনাশ করে দিলেন।' প্রাসাদের ছাদে আকবরের গর্ভধারিনী মা হামিদাবানু বেগমের আবির্ভাব দু'জনকেই চমকে দিল। আকবর উঠে দাঁড়িয়ে মাকে কুর্নিশ জানালেন। হামিদাবানু বললেন, 'বাছা মানুষের মুণ্ডু কাটতে পারো আর সামান্য ছেঁড়া জামা সেলাই করতে পারো না।' মহাম আনগা বললেন, 'কিন্তু ওসব হীন কাজ ও করবে কেন? দেশের লোক মানবে তাহলে? তাছাড়া বেগমদের উচিত হয়নি সম্রাটের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা।'

'একজন মানুষের সব কাজ শিখে রাখা উচিত। তা সে রাজাই হোক বা প্রজা। লোকেরা হাসাহাসি করবে না বরং গর্ববোধ করবে এরকম রাজার জন্য।'

'কিন্তু বেগমরা কী ঠিক করেছে জালালকে নিয়ে হাসি তামাশা করে?' মহাম আনগা তার যুক্তিতে অটল। 'দু'জনেই ছেলেমানুষ আনগা। অত বুদ্ধি ওদের কোথায়! আর করেছে-ই বা কী!'

আকবর বুঝতে পারলেন তাঁর দুই মা আপাতত এই নিয়ে কিছুক্ষণ লড়াই করবেন। এ তাঁর ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছেন। কিছুক্ষণ ঝগড়া শুনে নিজের ঘরে চলে এলেন। আজ সকাল থেকেই দিনটা খারাপ গেল। আল্লাহ'র নাম নিয়ে শুয়ে পড়লেন। পাখাওয়ালাদের ছুটি দিয়ে জানালা খুলে রেখেছেন। একটু একা থাকতে চান তিনি। একটু ঘুমও এসেছিল কিন্তু দরজায় দমাদম শব্দ শুনে উঠে পড়লেন। প্রথমে ভয় পেয়ে গেছিলেন। হাতের কাছে তরোয়ালটা হাতড়ে বার করলেন। *(এরপর ৮ পাতায়)*

রবিঠাকুরের পড়াশুনা

(১ পাতার পর)

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার শুরু বাড়ির ভৃত্যমহলে। চাণক্য শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ তখন ঠাকুরবাড়ির ভৃত্যমহলে পড়া হত। সেখানে উপস্থিত থাকতেন শিশু রবীন্দ্রনাথ। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হয়েছেন 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' বিদ্যালয়ে। কিছুদিন এখানে থাকার পরে রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হন নর্মাল স্কুলে। বিদ্যালয়ের থেকেও বেশি পড়তে হত বাড়িতে। তাঁর পঠনপাঠনের দায়িত্বে ছিলেন সেজকাকা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সময়ের শিশু রবীন্দ্রনাথের রুটিন জানলে তোমরা অবাক হবে। কাকভোরে উঠে কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তির পর সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষের কাছে পড়াশুনা। তারপর স্কুল। স্কুল থেকে ফিরে ড্রয়িং ও জিমনাস্টিক। শিক্ষক নীলকমল ঘোষের কাছে অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', রামপতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার', সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণীবৃত্তান্ত', মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়তেন। এছাড়াও ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, জ্যামিতিও ছিল। বাংলাভাষা শিক্ষা কিছুটা হওয়ার পরেই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র অঘোরবাবু শিশু রবীন্দ্রনাথকে সন্ধ্যাবেলায় ইংরাজি শেখাতে শুরু করলেন। First Book of Reading, Second Book of Reading, Macculloch's Course of Reading ইত্যাদি বই তাঁকে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু এই ইংরাজি শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের মোটেই ভালো লাগেনি। তবে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করতো সীতানাথ দত্তের প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা। তাঁর এতটাই ভালো লাগতো যে তিনি লিখেছিলেন, 'কোনও রবিবার তিনি না এলে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলেই মনে হত না।' পাশাপাশি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রের কাছে প্রাণিবিদ্যা এবং প্রতি রবিবার সকালে বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে গানের তালিমও নিতেন।

সত্যজিতের আঁকা রবীন্দ্রনাথ।

পাঠ্যবইয়ের বাইরে 'মৎস্যনারীর কথা', 'সুশীলার উপাখ্যান', 'রবিনসন ক্রুসো', কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন। এই সময়েই সম্ভবত চালর্স ডিকেন্সের লেখা 'ওল্ড কিউরিওসিটি শপ' পড়েছিলেন শিশু রবিঠাকুর।

১৮৭৩ সালে রবীন্দ্রনাথের ভারত-সফর শুরু। হিমালয়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে প্রথম পৌঁছান তাঁরা শান্তিনিকেতন। সঙ্গী বাবা দেবেন্দ্রনাথ। বাবার অত্যন্ত প্রিয় ভগবদ্গীতা পাঠ করেন তখনই। পরবর্তীতে বিভিন্ন চিঠিপত্রে, লেখায় গীতা'র কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের কাছে ইংরাজি শিক্ষা নেওয়ারও সুযোগ হয়েছিল হিমালয় ভ্রমণের সময়েই। তিনি Tales About England, Ireland, Scotland; Tales About Plants; Tales About the United States Of America; Universal History on the Basis of Geography; Tales About Sea; A Grammer of Modern Geography; Tales About Christmas পড়েন বলে মনে করা হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনীও রবীন্দ্রনাথ ইংরাজিতে পড়ে ফেলেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' ও 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা শেখার কথা আমরা জানতে পারি। এখানেও শিক্ষক পিতা দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বক্রোটা যাত্রার পথে ডাকবাংলোয় পৌঁছলে পিতৃদেব বাংলোর বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।' তোমরা অবাক হবে, বাবার কাছে শিশু রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতও শিখেছেন। 'ঋজুপাঠ', 'উপক্রমণিকা', 'মুগ্ধবোধ' ইত্যাদি ছিল সংস্কৃত শিক্ষার বই।

এরপরে রবীন্দ্রনাথের স্কুল পরিবর্তন। ভর্তি হয়েছিলেন বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে। কিন্তু সে স্কুল ভালো লাগতো না। স্কুল পালানোও শুরু হয়েছিল সেই সময়ে। এরপর রবীন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তির কথা জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে লুকিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' বইটি পড়েছিলেন তার উল্লেখ আছে। সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তির সময় রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে রাজনারায়ণ বসুও রবীন্দ্রনাথকে পড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গতানুগতিক পাঠ্যক্রমে বাঁধা পরাতে শিশু রবি একেবারেই রাজি ছিলেন না।

এই সময়েই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যকে রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সাহিত্যচর্চার মন দেন। সংস্কৃতে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' এবং ইংরাজিতে শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' পড়ানো শুরু করেন। শুধু পড়া নয়, জ্ঞানচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লিখিয়েও নিতেন। এই ভাবে ম্যাকবেথ নাটকটি পুরোটাই অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একইভাবে কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গের অনুবাদও করেছিলেন যা 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৪ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া শকুন্তলা, রঘুবংশও পড়েছিলেন কিশোর বয়সেই।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকার কয়েকটি খণ্ড তিনি পড়েছিলেন। সেই পত্রিকাতেই তিনি পড়েন 'পৌলবর্জিনী'র (Paul et Virginie) বাংলা অনুবাদ। এছাড়াও ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাস থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ পেলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার একনিষ্ঠ পাঠক।

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি লিখছেন, 'গুরুজনেরা ইহার (**প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ**-*লেখক*) গ্রাহক ছিলেন, নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না।' এইভাবেই 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', 'সত্যনারায়ণের পালা', 'গোবিন্দদাসের পদাবলী' পড়ে নেন রবিঠাকুর। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' অবশ্যই পড়েছিলেন। তবে ইংরাজি সাহিত্যের উন্মাদনাকে রবীন্দ্রনাথের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু, ইংরাজি সাহিত্যে এম.এ অক্ষয় চৌধুরী। সম্ভবত, অক্ষয় চৌধুরীর কাছে উৎসাহিত হয়েই টমাস চ্যাটার্টনের মতো নিজেকে ভেবে 'ভানুসিংহ' ছদ্মনাম নিয়ে লিখেছেন। এইসবের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় সাহিত্য রচনা। ১৮৭৪ সাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সরোজিনী' নাটকের জন্য রচনা করেন 'জ্বল জ্বল চিতা'

(এরপর ৮ পাতায়)

অচেনা সত্যজিৎ

(১ পাতার পর)

বাইন', 'হীরক রাজার দেশে' ছাড়াও 'দেবী' ও 'চিড়িয়াখানা' ছবির গান লিখেছিলেন। দেবী চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত শ্যামাসঙ্গীতটি গেয়েছিলেন একজন মুসলমান গায়ক।

'পথের পাঁচালী' ছবির জন্য ১৯৮২ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা লাভ করেছিল কিন্তু এই ছবির জন্য সত্যজিতের পারিশ্রমিক ছিল ৩ হাজার টাকা।

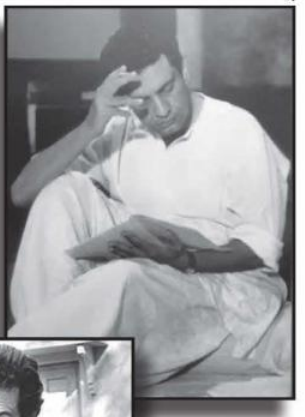

ইন্দিরা গান্ধি বেশ কয়েকবার সত্যজিৎকে ছবি বানাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। নেহরুর জীবনীও ছিল তার মধ্যে অন্যতম। প্রতিবারই সত্যজিৎ বিনয়ের সঙ্গে 'না' বলে জানিয়েছিলেন 'বিষয়গুলির ওপর আমার কোনো আগ্রহ নেই'।

আমেরিকার বিখ্যাত কবি অ্যালেন্স গিন্সবার্গ সত্যজিতের সঙ্গে দেখা করতে যান। গিন্স কথা বলেছিলেন চলচ্চিত্র নিয়ে আর সত্যজিৎ কথা বলেছিলেন আমেরিকার কবি এবং কবিতা নিয়ে।

১৯৫০ সালে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে বিভিন্ন দেশের পুস্তকের প্রচ্ছদ নিয়ে একটি প্রদর্শনীতে কুড়িটি দেশের বাছাই করা বইয়ের মলাটের ঠাঁই হয়েছিল। ভারতের মাত্র ৪টি বই সেই প্রদর্শনীতে ছিল। মজার কথা তার প্রত্যেকটির প্রকাশক সিগনেট প্রেস এবং প্রচ্ছদ শিল্পী সত্যজিৎ রায়।

১৯৬০ সালের আগে বাংলা সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল বাড়ন্ত। ভালোভাবে বাংলা লিখতে পারতেন না তিনি। সিগনেটের 'ডি কে' তাঁকে বাংলা বই উপহার দিয়ে তাতে লিখে দিয়েছিলেন 'বাংলা সাহিত্যে শূন্য জ্ঞানী মাণিককে'।

১৯৬১ সালে নবপর্যায়ে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর সন্দেশের জন্যই প্রথম বাংলা লিখতে শুরু করেন। এখন সত্যজিতের বই সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'বেস্টসেলার' তালিকায় শীর্ষে থাকে।

১৯৮১ সালে এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, 'আমার সংসার চলে প্রধানত বই লেখার টাকায়।'

হিন্দি, তেলেগু, মালয়লাম, ইংরাজি, ফারসি প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হয়েছে সত্যজিতের বই।

'আপনার জীবনে স্মরণীয় মুহূর্ত কোনটি' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, ''যখন ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের আন্তর্জাতিক জুরিদের প্রধান ঘোষণা করলেন - 'অপরাজিত' উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।"

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চলচ্চিত্রে একটি পাখির (Robin) ডাকের শব্দের প্রয়োজন ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজিতেও সেই ডাক না পাওয়ার পর তিনি শিস দিয়ে সেই শব্দ রেকর্ড করেন।

সত্যজিৎ রায়ের তৈরি 'Ray Roman' নামে টাইপ ফেসটি এখনও একটি আমেরিকান ফার্ম বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে।

পাশ্চাত্য রাগ সঙ্গীতের রেকর্ড সংগ্রহ করা ছাড়াও সত্যজিতের প্রিয় সখ দেশি বিদেশি 'ইন্ডোর গেমস' সংগ্রহ।

অভিযানের আনন্দ ...

হিলারি স্টেপেও মই!

জয়ন্ত দত্ত

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক 'অভিযানের আনন্দ'। এই কলমে ধারাবাহিক ভাবে লিখবেন বাঙালি অভিযাত্রীরা। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানের পাশাপাশি থাকবে গঙ্গার উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নৌকাভিযানের কথাও। মাকালু জয়ের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এখানে ঠাঁই পাবে ভারতের বুকে 'কোস্টাল ট্রেকিং'-এর রোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ। অভিযানের এই গল্প কিচির মিচির-এর পাতায় যে সময় শুরু হতে চলেছে অর্থাৎ ২০১৪ সালেই প্রথম ভারতীয় হিসেবে এভারেস্ট জয়ী তেনজিং নোরগে'র জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। আবার তেনজিংয়ের জন্মশতবর্ষেই এভারেস্ট অভিযানে ঘটে গেল অন্যতম বড়ো দুর্ঘটনা, মৃতের সংখ্যা ১৩-র আশেপাশে। আশ্চর্য হলেও সত্যি, তেনজিং-হিলারি প্রথমবার এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখার পর গত ৬১ বছরে প্রায় ৭ হাজার অভিযাত্রীর কাছে হার মেনেছে বিশ্বের এই উচ্চতম পর্বত শিখর।

কিন্তু তেনজিংদের আমলে বিষয়টি কিন্তু মোটেই এইরকম ছিল না। তখন শৃঙ্গজয় করা প্রায় যুদ্ধ জয়ের সমান। ১৯৫৩ সালে যখন তেনজিং-হিলারি এভারেস্ট অভিযান করেন তখন তাঁদের দলে অভিযাত্রীরা ছাড়াও ছিলেন ৩৬২ জন মালবাহক এবং ২০ জন শেরপা! তেনজিংয়ের জন্মশতবর্ষে এসে এখন শুধু টাকা থাকলেই এভারেস্ট চড়া যায়। তবে সেখানেও দেখা গিয়েছে সমস্যা। ২০১৩ সালে এভারেস্ট অভিযানে ৮ পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়। ২৮,৭৪০ ফুট উচ্চতায় হিলারি স্টেপ-এ পর্বতারোহীদের ভিড় লেগে যাওয়ায় অনেকক্ষণ সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অর্থাৎ কলকাতার যানজটের মতো এভারেস্টে 'অভিযাত্রী-জট'। সেই অপেক্ষাতে পিঠে থাকা অক্সিজেন সিলিন্ডারের অক্সিজেন শেষ। ভাবা যায়! অবশ্য নেপাল সরকারও খুব সহৃদয়। তারা জানিয়েছে, হিলারি স্টেপে পর্বতারোহীদের আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিযাত্রী-জটে আটকে থাকতে হবে না। এখানে পাকাপাকি ভাবে ধাতব মই লাগিয়ে দেওয়া হবে। এসো, মই চড়ো, এভারেস্ট জয় করো - ব্যাপারটা এরকমই হতে চলেছে। ভাগ্যিস 'কাল করবো' বলে রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে পারেনি। না হলে সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার ভিড় তাক লাগিয়ে দিত সবাইকে।

এসো, দেখে নিই তেনজিং নোরগের সহযাত্রী এডমুন্ড হিলারি এই খাঁড়া পাথরটি সম্পর্কে কী বলেছিলেন। খাঁড়া পাথরটিকে পরবর্তী সময়ে 'হিলারি স্টেপ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আসলে হিলারি স্টেপ এভারেস্টের (২৯,০২৮ ফুট) চূড়ায় পৌঁছানোর আগে শেষ বাধা। এটি একটি ৪০ ফুটের খাঁড়া পাথরের দেওয়াল। শেরপা, অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরা এখানে দড়ি লাগান। তারপর ঝুলতে ঝুলতে এই বাধা টপকে রওনা হন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরের দিকে। বাকি সেই পথ মোটামুটি সহজ। এডমুন্ড হিলারি তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'সাফল্য ও ব্যর্থতার তফাত করে দেওয়ার জন্য যেন দাঁড়িয়ে আছে এই খাঁড়া দেওয়াল।' প্রকৃতির এই বাধাকে প্রথম অতিক্রম করেছিলেন হিলারি আর সেই কারণেই এই বাধার নামকরণ হিলারি স্টেপ। কিন্তু সেখানে ধাতব মই! হিলারি শুনে সমাধিতেও কানে আঙুল দিয়েছেন হয়তো!

প্রথম ভারতীয় হিসেবে যে তেনজিং নোরগে এভারেস্টের চূড়ায় প্রথম পা রেখেছিলেন তাঁর ছেলে এভারেস্ট জয়ী জামলিং তেনজিং নোরগে বলেন, 'এখন যা হচ্ছে তা অভিযান নাকি? লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করে যে কেউ এভারেস্টে উঠে যাচ্ছেন। এঁরা নিজেদেরটা ছাড়া কিছুই ভাবেন না, স্বার্থপর। অন্যদের জীবনও বিপন্ন করছেন।' সত্যিই তাই। এই বছরে যে শেরপারা খুম্বু হিমবাহে বরফে চাপা পড়ে মারা গেলেন তাঁরা অভিযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আগেভাগে ক্রিভাসের উপর মই লাগাচ্ছিলেন। এটা কী অভিযান?

অথচ চলতি বছরে যে তেনজিং নোরগের জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে, সেই ভদ্রলোক নিজেও নিজের জন্মতারিখ জানতেন না, এতটাই গরিব পরিবারে তাঁর জন্ম। তখন আবহাওয়া ও শস্য উৎপাদন দেখে জন্মমাস নির্ধারিত হত। তবে ২৯মে তারিখে তিনি এভারেস্টের চূড়ায় পদার্পণ করেন, সেই তারিখকেই পরবর্তী সময়ে নিজের জন্মতারিখ হিসেবে পালন করতেন তেনজিং। তিব্বতী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তেনজিং-এর জন্মবছর ছিল 'ইয়ার অফ্ র‍্যাবিট'। সেই হিসেবে ১৯১৪ সালে তাঁর জন্ম। তেনজিং নোরগে নিজে যেমন শেরপা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তেমনই পাহাড়ে চড়াতেই ছিলেন ওস্তাদ। মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৯৩৫ সালে এরিক শিপটনের দলের একজন সদস্য হিসেবে তেনজিং এভারেস্ট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিংশ শতাব্দীর ৩-য়ের দশকে তিনটি সরকারি ব্রিটিশ অভিযানে 'হাই-অল্টিচুড পোর্টার' হিসেবে তেনজিং অংশ নেন। তাঁর মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত। ভদ্র ব্যবহারও তেনজিং-এর অন্যতম গুণ ছিল। ১৯৪৭ সালে কানাডার আর্ল ডেনম্যানের নেতৃত্বে এভারেস্ট অভিযানে তেনজিং অন্যতম সদস্য ছিলেন। যদিও সেই অভিযান ব্যর্থ হয়। তাঁরা 'সাউথ-ইস্ট রিজ' ধরে ২৮,১৯৯ ফুট পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হন, যা তৎকালীন সর্বোচ্চ। অবশেষে ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ অভিযানে আবার তেনজিং অংশ নেন। সেটি ছিল তাঁর সপ্তম এভারেস্ট বিজয়ের প্রচেষ্টা। তেনজিং একটি 'ক্রিভাস' বা বরফের ফাটলের মৃত্যুফাঁদ থেকে এডমুন্ড হিলারিকে উদ্ধার করেন। তবে শেষ পর্যন্ত 'হিলারি স্টেপ' (পরবর্তীতে নামকরণ) অতিক্রম করে ২৯ মে বেলা ১১.৩০-এ পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছান হিলারি এবং তেনজিং। হিলারি বলছেন, 'আ ফিউ মোর হোয়াক্স অফ দ্য আইস-এক্স ইন দি ফার্ম স্নো, অ্যান্ড উই স্টুড অন দি টপ'। দুই অভিযাত্রী প্রায় ১৫ মিনিট সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিলেন। আইস-এক্স হাতে এভারেস্টের চূড়ায় তেনজিং-এর বিখ্যাত ছবি হিলারি ক্যামেরায় বন্দী করেন। কিন্তু তেনজিং কোনোদিন ক্যামেরায় ছবি তোলেননি, ফলে এভারেস্টের চূড়ায় হিলারির কোনো ছবি নেই। ভাবা যায়? তেনজিং ও হিলারির মধ্যে কে আগে চূড়ায় পা রেখেছিলেন তা পৃথিবী কোনোদিন জানতে পারেনি, কিন্তু গত বছর, ২০১৩ সালে, কে আগে এভারেস্ট পৌঁছাবে তা নিয়ে অভিযাত্রীদের মধ্যে মারামারি, রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে!

হিলারি এভারেস্ট জয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, জয় করে নেমে আসছি দুজনে। পথে টিমমেট জর্জ লোয়ি'র সঙ্গে দেখা। হিলারিই প্রথম আনন্দের খবর জর্জকে জানাচ্ছেন, 'ওয়েল জর্জ, উই নকড্ দ্য বাস্টার্ড অফ্।' আসলে একটা জয়ের আনন্দ তখন ছিলো। এখনকার মতো স্বার্থপরতা ছিল না। টাকার জোরে হুজুগে ভিড়ও ছিল না।

এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে

খুম্বু হিমবাহ

আঁকি-বুঁকি

অন্বেষা ঘোষ
শ্রেণি - অষ্টম, এম বি বিড়লা ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমি, কলকাতা

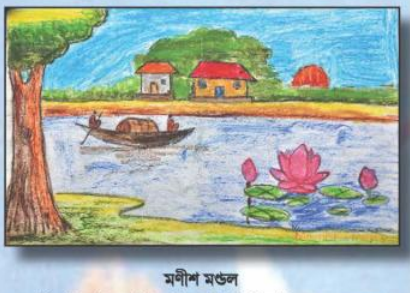

মণীশ মণ্ডল
শ্রেণি - ট্রানজিশন, দি স্কটিশ চার্চ কলিজিয়েট স্কুল, কলকাতা

সম্প্রীতি মণ্ডল
শ্রেণি - সপ্তম, বাগবাজার মাল্টিপারপাস গার্লস' স্কুল, কলকাতা

আঁকি-বুকি'তে পাঠাতে পারো ছবি। ছবি পাঠানোর ঠিকানা
কিচির মিচির
৯, কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১
পাঠাতে পারো ই-মেল করেও।
আমাদের ই-মেল - kichirmichirkol@gmail.com

একটি পাহাড়ি অঞ্চলের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

কচি পাতা

অজানাকে জানা, অজানাকে দেখার আগ্রহ মানুষের চিরকাল। তাই অজানাকে জানার জন্য, অচেনাকে চেনার জন্য মানুষ বেড়াতে যায়। তাই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে মধুর। বর্তমান যুগে দৈনন্দিন জীবনে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি মন যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে তখনই মানুষ বৈচিত্র্যের আকর্ষণে মনে-প্রাণে উৎসাহ যোগাতে ভ্রমণের তাগিদ অনুভব করে। ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যে মনে প্রফুল্লতা আসে, জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণ হয়। অপরকে আপন করার মনোবৃত্তি জন্মায়। দীর্ঘদিন সীমিত গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকলে মানুষের মন স্বভাবতই সংকীর্ণতার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভ্রমণের মাধ্যমে সংকীর্ণতা ও মানসিকা জড়তা দূর করা যায়। তাই যে কোনো ভ্রমণের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অপরিসীম। গত পুজোর ছুটিতে দার্জিলিং ভ্রমণের স্মৃতি আমার স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে রয়েছে। আমরা যে হলিডে হোমে ছিলাম সেখান থেকে বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া দেখা যেত। রাতে হলিডে হোম থেকে গোটা শহরটাকে ছায়ার মতো দেখাতো। দার্জিলিং শহরের মাঝখানে একটি টিলামতো উঁচু জায়গা রয়েছে। এটি অবজারভেটরি পাহাড় নামে খ্যাত। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ রূপের কাছে সব কিছুই ম্লান। সকালে সূর্যের সোনাগলা আলো যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া থেকে ঠিকরে পড়ে তখন চোখ ফেরানো যায় না। আমরা টাইগার হিলে উঠেছিলাম জিপে করে। চড়াই উৎরাই পথ। যেমন ভয়ঙ্কর তেমন সুন্দর। একপাশে গাছ, একপাশে পাহাড়, মাঝখানে রাস্তা। টাইগার হিলের সূর্য ওঠার দৃশ্য লিখে বর্ণনা করা যায় না। সূর্যটা কখনো যেন সোনার থালা, কখনো যেমন চক্রাকার জ্যোতি। দার্জিলিং-এ জলাপাহাড়, ম্যাল, রাজবাড়ি, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো স্বপ্নের দেশে চলে এসেছি। তাই এই ভ্রমণের স্মৃতি আমার কাছে চির জাগরুক এবং এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে।

শ্রেয়ান পালচৌধুরী
শ্রেণি : ষষ্ঠ
মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রম উচ্চবিদ্যালয়, হুগলি

শনির চাঁদ বাড়ছে!

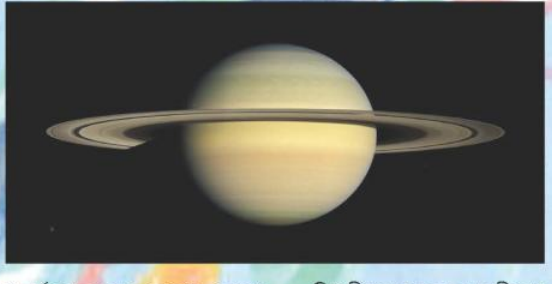

নাসা'র (আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা) বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি শনি গ্রহ নিয়ে নতুন তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নাসা'র ক্যাসিলি-হিউজেন মহাকাশযানের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এক দুর্লভ মহাজাগতিক ছবি। সেই ছবির তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যাচ্ছে, সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা ৬২ থেকে বেড়ে ৬৩ হতে চলেছে। বিজ্ঞানীরা নবতম এই উপগ্রহের নাম দিয়েছেন 'পেগি'। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, শনিগ্রহকে ঘিরে থাকা বলয়ের মধ্যে থেকেই সৃষ্টি হতে চলেছে পেগি'র। তোমরা জানো যে, শনিগ্রহের বলয়টি আসলে বিভিন্ন মাপের পাথরের টুকরো ও জমাট বরফ দিয়ে তৈরি। ক্রমাগত আবর্তনের সময় পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ও আকর্ষণের ফলে কোনো কোনো বস্তুখন্ডের আয়তন বাড়তে থাকে। পেগি'র ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছে বলে ধারণা। তার আয়তন এখন এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে সে আর বলয়ের মধ্যে না থেকে সরাসরি শনির চারপাশে পৃথক পাথুরে খণ্ড হিসেবে ঘুরতে শুরু করবে।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, অতীতেও শনির বলয় এইভাবে আরও উপগ্রহের জন্ম দিয়েছে। সদ্যজ্যাত উপগ্রহের ব্যাস ১ কিলোমিটারের মতো হবে বলে মনে করছেন নাসা'র বিজ্ঞানীরা।

সুস্নাত সরকার
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী
উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, হুগলি

ছন্দ মেলাও

কবিগুরুর ____ আজ
২৫শে ____
____ - গল্পে - কবিতায়
____ হয়ে থাক।

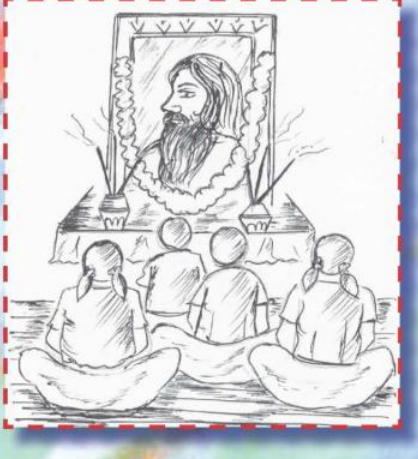

রূপায়নে-
সুদীপ্ত ভান্ডারী

উত্তর পাঠাতে পারো। এই ঠিকানায়
কিচির মিচির, ৯, কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১

কিচির মিচির-এর পক্ষে রিমা ঘোষদস্তু কর্তৃক ৯, কৈলাস ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং তাজ এন্টারপ্রাইজ, ৬ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদীপ্ত চক্রবর্তী।
E-mail : kichirmichirkol@gmail.com.
Title registration - WBBEN14929/25/1/2014-TC.